কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

ডিসেম্বর '৮১

Hard Copy & Scan - Subhajit Kundu
Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

স্কুলের বই : ১৯৮২

সাহিত্য পাঠ, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম
প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত
সাহিত্য পরিচয় ১ম ষষ্ঠ
সুশীল বসু সম্পাদিত
সাহিত্য পরিচয় ২য় ৭ম
শচীন বিশ্বাস সম্পাদিত
সাহিত্য পরিচয় ৩য় ৮ম

সহায়ক পাঠ, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম
দক্ষিণারঞ্জন বসু সম্পাদিত
কাহিনী পরিচয় ১ম ষষ্ঠ
কাহিনী পরিচয় ২য় ৭ম
গল্পবিচিত্রা ৮ম

ভাষা শিক্ষা, ৭ম, ৮ম
আশিস সান্যাল ও শচীন বিশ্বাস
ভাষা পরিচয় (প্রবন্ধ ও ব্যাকরণ) ৭ম। ৮ম
পণ্ডিত শিবশঙ্কর শাস্ত্রী
ব্যাকরণ পরিচয় ষষ্ঠ

ভূগোল, ৬ষ্ঠ, ৭ম
অধ্যাপক নীলোৎপল শ্যাম
ভূগোল পরিচয় ১ম ষষ্ঠ
ভূগোল পরিচয় ২য় ৭ম

বিজ্ঞান ও গণিত
দুলাল বল
বিজ্ঞান পরিচয় ৭ম
জ্যামিতি পরিচয় ষষ্ঠ

ইতিহাস, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম
অধ্যাপক নির্মল মল্লিক চৌধুরী
সভ্যতার পরিচয় ষষ্ঠ
অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
ইতিবৃত্তিকা ৭ম
ইতিবৃত্তিকা ৮ম

সাধারণ জ্ঞান, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম
অখিল নিয়োগী সম্পাদিত
স্বপনবুড়ো বুক অব নলেজ

জীবন বিজ্ঞান, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম
অধ্যাপক তারাচাঁদ নন্দী, ডঃ শকুন্তলা নন্দী ও
অধ্যাপক দীপক নন্দী
প্রাণী ও প্রকৃতি পরিচয় ১ম ৬ষ্ঠ
প্রাণী ও প্রকৃতি পরিচয় ২য় ৭ম
প্রাণী ও প্রকৃতি পরিচয় ৩য় ৮ম

শৈব্যা পুস্তকালয়
৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ৭৩ . ৩৪ ৮৫৪৩

GEOGRAPHY VIII, IX, X
নীরেন সেন
ভূগোল পরিচয়

অধ্যাপক জহরলাল গুহ ও অধ্যাপক নীলোৎপল শ্যাম
মাধ্যমিক ভূগোল ১ম IX

অধ্যাপক জহরলাল গুহ ও অধ্যাপক নীলোৎপল শ্যাম
মাধ্যমিক ভূগোল ২য় X

PHYSICAL SCIENCE, IX, X
অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও
অধ্যাপক বিশ্বনাথ দাসঘোষ
মাধ্যমিক বিজ্ঞান ১ম IX

অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও
অধ্যাপক বিশ্বনাথ দাসঘোষ
মাধ্যমিক বিজ্ঞান ২য় X

LIFE SCIENCE, IX, X
অধ্যাপক তারাচাঁদ নন্দী, ডঃ বলেন নন্দী ও
অধ্যাপক সতীনাথ সেন
মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান ১ম IX

অধ্যাপক সতীনাথ সেন, ডঃ বলেন নন্দী ও
অধ্যাপক তারাচাঁদ নন্দী
মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান ২য় X

MATHEMATICS, VIII
ডঃ জ্ঞানেন্দ্রগোপাল চক্রবর্তী
ডঃ প্রভাতরঞ্জন ঘোষ
মাধ্যমিক পাটীগণিত ৮ম

SANSKRIT GRAMMAR
Dr. Gourinath Sastri
Essentials of Sanskrit & Composition

WORK BOOK SERIES
By A Board of Editors
Practice in Objective
Mathematics IX X
Work Book in Geography VII
Work Book in Geography VI

দি পাইওনিয়ার পাবলিকেশানস্
৮-১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ৭৩ . ৩৪ ৮৫৪৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা ॥ ডিসেম্বর ১৯৮১
প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর
সম্পাদক : রবীন বল
সহ-সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

সম্পাদকীয়

এই সংখ্যা যখন তোমাদের হাতে পৌছবে তখন বোধহয় সকলেরই পরীক্ষা শেষ—কিম্বা সবে শেষ হচ্ছে। 'চিঠিপত্র' বিভাগে ও ছোটদের দপ্তরে প্রচুর লেখা ও চিঠিপত্র এসেছে, কিন্তু অনিবার্য কারণে এবারে 'চিঠিপত্র' বিভাগ প্রকাশ করতে না পারায় আমরা দুঃখিত। তবে আগামী সংখ্যা থেকে অবশ্যই থাকবে—এবং সেই সঙ্গে 'পড়াশোনা' বিভাগে পদার্থবিদ্যার উপরে ধারাবাহিক লেখা শুরু করবেন ডঃ অলক চক্রবর্তী।

॥ সূচীপত্র ॥

সম্পাদকীয় : ১

দপ্তর থেকে
সেই ভৌতিক মেঘ : সমরজিৎ কর ২

পুনর্মুদ্রণ
মাংসাশীবর্গ : ভালুক ॥ যোগীন্দ্রনাথ সরকার ৩৭

উপন্যাস
শার্লক হোমস্ প্রফেসর চ্যালেঞ্জার ও মঙ্গলগ্রহ ॥ অদ্রীশ বর্ধন ৫

গল্প
একটি দ্বীপের জন্ম ॥ বিমান বসু ১৯

পড়াশোনা
রসায়নের সহজপাঠ ॥ অমরনাথ রায় ২৪
জীবনবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ ॥ তারকমোহন দাশ ১৪
কিছু পরিমিতি সমস্যা ॥ অসীম মুখোপাধ্যায় ৩৩

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা
মাটি থেকে আকাশে ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী ৪১
বিরলপ্রাণী—পেঁচা ॥ ধীরেন দত্ত ৪৫
আকাশ কেন নীল ? ॥ নিকুঞ্জবিহারী ঘোড়াই ৪২
সমুদ্র-পথের সাথী অ্যালবাট্রস ॥ প্রদীপ দাস ৯
ইউক্যালিপটাস কী ॥ আরতি মুখার্জী ১১
মুক্তোর জন্ম কাহিনী ॥ হীরক দাশ ১২
বিজ্ঞানের যুদ্ধ ॥ নারায়ণ চন্দ ১৭
বিচিত্র ব্যবসা ॥ বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী ২১
মনোবিজ্ঞানের স্বপ্ন ॥ পৃথা বল ৩৫
প্রতিবন্ধীদের বান্ধব ॥ দক্ষিণারঞ্জন বসু ৩৯
'১'এর মজা ॥ সজল চক্রবর্তী ১৩

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী
নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী '৮১ ॥ রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩

ছবিতে গল্প
অজানা মহাকাশে ॥ দেবদাস ৪৭
বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র ॥ দিলীপ দাস ৩১
টোয়েন্টী থাউজেণ্ড লীগস্
আণ্ডার দি সী ॥ গৌতম কর্মকার ২২
হাবুলের বিজ্ঞান ভাবনা ॥ ধীরেন বল ৫৬
খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস ১৬

আবিষ্কারের গল্প
সূতা কাটার কল ॥ সুধাংশু পাত্র ১০

ছোটদের দপ্তর
রোবটের হল মৃত্যু ॥ শান্তনু নায়েক ৫২
প্রাণিজগতে বৈচিত্র্য ॥ নিলয় সরকার ৫৪
ভেবে ভেবে বল ॥ শুভব্রত রায়চৌধুরী ৫০
বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা ॥ বৈজ্ঞানিক ৫০
প্রশ্নোত্তর ॥ ৫১ বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার সমাধান ॥ ৫৫
বিজ্ঞান সংবাদ ॥ ৪

ভ্রম সংশোধন : গত সংখ্যার সূচীপত্রে পেট্রোলিয়ামের **ইতিবৃত্ত : সুদীপ্ত দাশগুপ্ত** পড়তে হবে।

সেই ভৌতিক মেঘ

সমরজিৎ কর

অদ্ভুতই বটে! বিচিত্র সেই মেঘের প্রথম সন্ধান দিয়েছিলেন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক, ১৮৮৫ সালে। নাম ভিটোল্ড জেরাস্কি। আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অবাকই হয়েছিলেন। তাঁদের মনে হয়, এ মেঘ, পৃথিবীর নয়। মহাকাশ থেকে ভেসে আসা কোন বিশেষ আগন্তুক। কিন্তু আজও, দীর্ঘ ছিয়ানব্বুই বছর পর, সমাধান তো দূরের কথা, বরং রহস্য আরও ঘনীভূত হচ্ছে।

একটু লক্ষ করলে সে মেঘ তোমরাও দেখতে পাবে। সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্তের কিছু আগে আকাশ যখন প্রত্যুষ গোধূলির আলোয় উদ্ভাসিত হয়, ইংরেজিতে যাকে বলে 'টোয়াইলাইট'—দেখবে, তারই আভায় ভেসে উঠেছে অদ্ভুত এক ধরনের রূপোলী মেঘ। মনে হয় যেন মসলিনের টুকরোর মত। হাল্কা সেই মেঘের টুকরোর ভেতর দিয়ে দূরাকাশের গ্রহ নক্ষত্রও তোমাদের চোখে পড়বে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, দিন এবং রাতের সন্ধিক্ষণে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর সেই মেঘ অদৃশ্য হয়। আকাশের বুকে তখন তার অস্তিত্ব খুঁজে বের করা শক্ত।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এর নাম রেখেছেন 'নকটিলুসেন্ট ক্লাউড'। বাংলা করলে দাঁড়ায় 'নিশিদীপ্ত মেঘ।' জেরাস্কি এই মেঘের কথা প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীমহলে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, শুরু হল অনুসন্ধান। আবিষ্কারের এক বছরের মধ্যেই জানা গেল পৃথিবী থেকে ওই মেঘের দূরত্ব পঁচাত্তর থেকে পঁচাশি কিলোমিটার।

তাজ্জব ব্যাপার! পৃথিবী থেকে অত দূরের ঊর্ধ্বাকাশে মেঘ এলো কোত্থেকে? বিজ্ঞানীদের কাছে তখন এটাই হয়ে দাঁড়াল বড় রকমের প্রশ্ন।

বায়ুমণ্ডলের ওই অংশের নাম 'মেসোস্ফিয়ার' বা মধ্যস্তর। অনেকেই হয়ত জান, ভূপৃষ্ঠের ঠিক ওপরের বাতাসের স্তরকে বলা হয় 'ট্রপোস্ফিয়ার' বা উষ্ণস্তর। পৃথিবীর দুই মেরু অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠ থেকে এই স্তরের দূরত্ব প্রায় আট কিলোমিটার। কিন্তু নিরক্ষ অঞ্চল থেকে পনের কিলোমিটারের মত। উষ্ণ বায়ুস্তরের উপরে রয়েছে অপেক্ষাকৃত হাল্কা বায়ুর আরও একটি স্তর, যার নাম 'স্ট্রাটোস্ফিয়ার' উষ্ণস্তরের উপর প্রায় পঞ্চান্ন কিলোমিটারের মত বিস্তৃত, এর পরই শুরু মেসোস্ফিয়ারের। এই মেসোস্ফিয়ারেই কিনা সেই নিশিদীপ্ত মেঘ!

অল্পদিনের মধ্যে আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, নিশিদীপ্ত মেঘ, আমরা আকাশে সচরাচর যে শুভ্র-ধূসর মেঘ দেখে থাকি, তা থেকে স্বতন্ত্র। কারণ, জলীয় বাষ্পের মেঘ পনের কিলোমিটারের বেশি ঊর্ধ্বাকাশে সাধারণতঃ চোখে পড়ার কথা নয়।

অতএব প্রশ্ন উঠল আবহাওয়ামণ্ডলের অত ঊর্ধ্বে অমন অদ্ভুত দর্শন রূপোলী মেঘের উৎস কোথায়? কী দিয়ে তৈরী ওই মেঘ। অত ঊর্ধ্বাকাশে ওই মেঘ এলোই বা কিভাবে মজার ব্যাপার এই, দীর্ঘ ছিয়ানব্বুই বছর পর আজও এ সব প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তরই পাওয়া যায় নি। অবশ্য কোনও কোনও বিজ্ঞানী সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, বিচিত্র এই মেঘের জন্ম পৃথিবীতে নয়। সম্ভবত মহাকাশের ভিন কোন অঞ্চল থেকে এসে ওই মেঘ স্তরে স্তরে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে। এবং কোন অজ্ঞাত কারণে সেখানেই বাস করে।

কিন্তু কতকগুলি ব্যাপার লক্ষ করার মত।

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার জন্যে ইতিমধ্যে নানা রকম তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। কেউ কেউ বলছেন, সাধারণ মেঘ বলতে যা বোঝায়, নিশিদীপ্ত মেঘ সে রকম কিছু নয়। এই মেঘ তৈরী করে উল্কা। তাঁরা মনে করছেন, দূরাকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে অজস্র উল্কাপিণ্ড। বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার পর তারা জ্বলতে থাকে। কয়লা পুড়ে যাওয়ার পর যেমন ছাই তৈরি হয়, জ্বলার পর ঠিক তেমনি উল্কাপিণ্ডগুলির অবশেষ হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে ভস্মই সৃষ্টি করে নিশিদীপ্ত মেঘ।

ঠিক কথা। কিন্তু বাদ সাধলেন কোনও কোনও বিজ্ঞানী। তাঁরা বললেন, যদি জ্বলন্ত উল্কার ভস্ম থেকে ওই মেঘের জন্ম হয়, তাহলে আকাশের সব জায়গায় তো ওই নিশিদীপ্ত মেঘ দেখা পাওয়ার কথা। কারণ পৃথিবীর সর্বত্রই তো উল্কাপাত ঘটে। দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর পঞ্চাশ থেকে সত্তর ডিগ্রি উত্তর এবং চল্লিশ থেকে ষাট ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ আকাশেই ওই মেঘের সমাগম। কেন এটা হবে? কেন অন্যত্র দেখা যাবে না? আরও একটি ব্যাপার। পর্যবেক্ষকরা বলছেন,

সেই ভৌতিক মেঘ

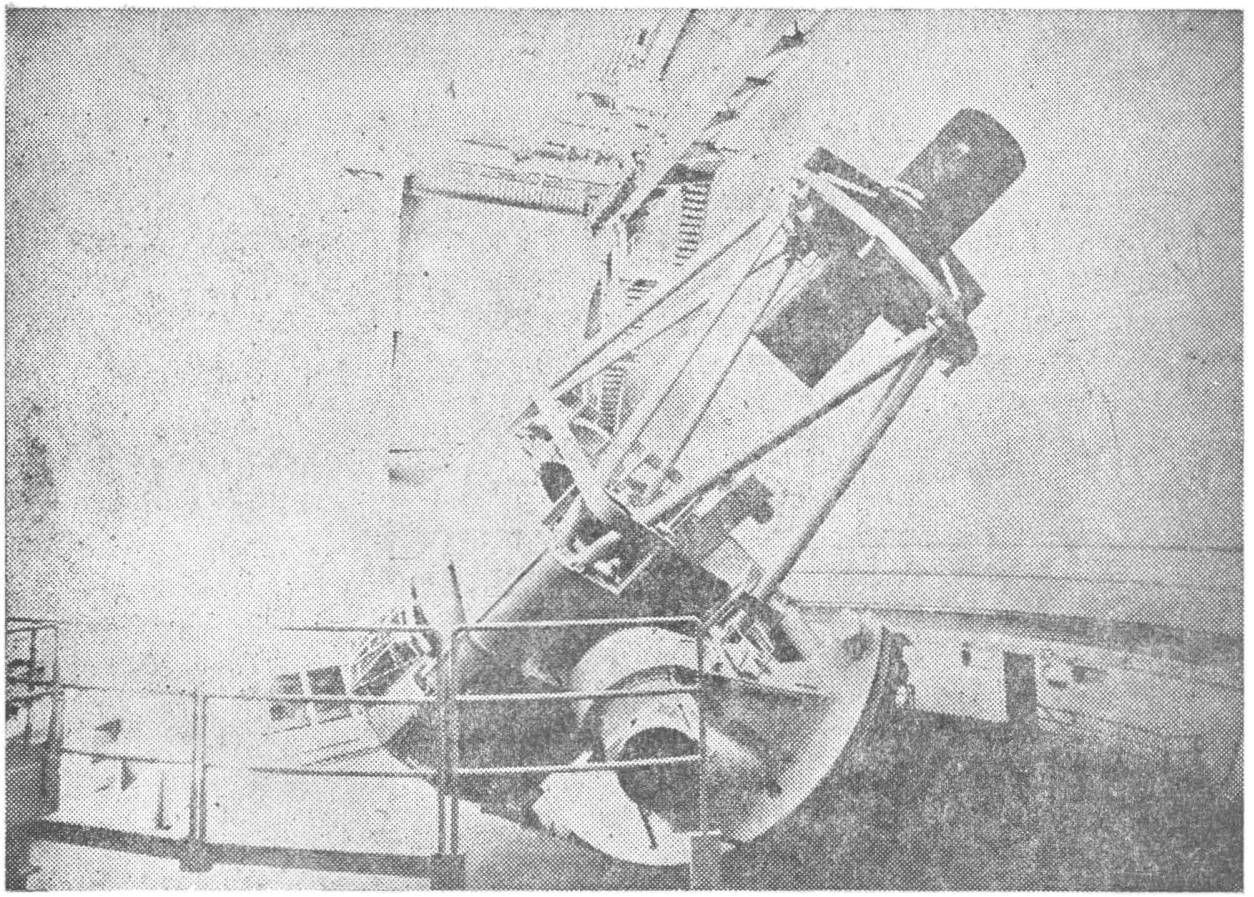

নিশিদীপ্ত মেঘ পরীক্ষনের আধুনিক যন্ত্র

একমাত্র গ্রীষ্মকালেই এ ধরনের মেঘ জমতে দেখা যায়। অথচ দেখা যায়, বছরের ওই সময় উল্কা-বর্ষণ ঘটে অনেক কম। যদি তাই হয়, ওই সময় নিশিদীপ্ত মেঘ তৈরি হওয়ার তো কথা নয়?

ব্যাপারটা খুঁটিয়ে পরীক্ষার জন্যে ১৯৫৭ সাল থেকে সোভিয়েত দেশের আবহাওয়া বিজ্ঞান দপ্তর নিয়মিত অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। এই দপ্তরের বিজ্ঞানীরা বলছেন, হতেও পারে—উল্কার ভস্মীভূত অবশেষই তৈরি করে ওই মেঘ। উল্কার ভস্ম এবং মহাজাগতিক কণা জলীয় বাষ্পের সঙ্গে মিশে যদি অমন ধরনের কোন মেঘ সৃষ্টি করে তাতে অবাক হওয়ার কোন কারণ নেই।

কয়েক বছর আগে, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক নাম আইভান খভোস্তিকোভ, তিনি বলছেন, আকাশের যে অঞ্চলে ওই মেঘ দেখা যায় গরমের সময় সেখানকার তাপমাত্রা শীতকালীন তাপমাত্রার চেয়ে অনেক নিচে থাকে। গরমের সময় পৃথিবীর বুক থেকে জলীয় বাষ্প আকাশের দিকে উঠতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ভেদ করে মেসোস্ফিয়ারে এসে জমতে থাকে। তখন অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় ওই জলীয় বাষ্প সেখানে জমে থাকা ভাসমান ধূলিকণার সঙ্গে মিশে তৈরি করে মেঘের স্তর। বছরের অন্য সময় ওই অঞ্চলের তাপমাত্রা বাড়লে জলকণা বাষ্পে রূপান্তরিত হয়। ফলে মেঘও আর দেখা যায় না। ধূলিকণা বলতে এখানে অবশ্য উল্কাপিণ্ড তৈরি ভস্মের কথাই বলা হচ্ছে।

প্রশ্ন উঠল আবার, ভাল কথা। জলীয়, বাষ্প না হয় অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় জমে মেঘ তৈরি করল, বিশেষ অঞ্চলে কেন? কেন অন্যত্র নয়? এই সঙ্গে আরও বলা হল, মেসোস্ফিয়ারের মত ঊর্ধ্ববায়ুস্তরে জলীয় কণার অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। অন্ততঃ রকেট বা অনুরূপ কোন ব্যবস্থায় পর্যবেক্ষণ চালিয়ে বিজ্ঞানীদের এটাই তো মনে হয়েছে। এমন কি কয়েক বছর আগে বেলুনের সাহায্যে অত্যন্ত সংবেদনশীল যন্ত্র পাঠান হয়েছিল

ঊর্ধ্বাকাশে। সেই যন্ত্র স্ট্রাটোস্ফিয়ার সম্পর্কে যে সব তথ্য পাঠিয়েছে, তাতে দেখা যায় আকাশের ওই অঞ্চলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুবই কম। বাতাসের প্রতি দশলক্ষ ভাগের দুই ভাগ মাত্র। যদি স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারেই এত কম জল থাকে, মেসোস্ফিয়ারকে তা হলে তো বলতে হয় একেবারে জলহীন। অতএব পৃথিবীর বুক থেকে জলীয় বাষ্প গিয়ে নিশিদীপ্ত মেঘ তৈরি করবে কী করে তা সম্ভব?

এবার এগিয়ে এলেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। সুইডেন থেকে ঊর্ধ্বাকাশে রকেট তোলা হল। সেই রকেটে পাঠান হল নানা রকম যন্ত্র। ওই সব যন্ত্র নিশিদীপ্ত মেঘের কিছুটা নমুনা সংগ্রহ করে ফিরে এল পৃথিবীর বুকে।

সেই নমুনা পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা তো অবাক। নমুনার মধ্যে পাওয়া গেল নানা রকম বস্তুকণা। লোহা, নিকেল প্রভৃতি থেকে শুরু করে বরফ কুচি। বরফকুচি যখন পাওয়া গেল, বুঝতে হবে মেসোস্ফিয়ারে জলকণাও রয়েছে। কোথা থেকে এল এই জল? কেউ কেউ বললেন, হ্যাঁ, জল পাওয়া গেছে ঠিকই, তবে এই জল পৃথিবীর জল নয়। এই জল তৈরি করেছে সূর্য। ঊর্ধ্বাকাশের বায়ুস্তরে বিচরণ করে মুক্ত ইলেকট্রন কণা। সূর্য থেকে প্রতিমুহূর্তে বর্ষিত হচ্ছে নানা রকম পারমাণবিক কণা। যাদের মধ্যে প্রোটন কণাও থাকে। আসলে হচ্ছে কি। ওই প্রোটনের এক একটি কণা বায়ুস্তরে এসে এক একটি মুক্ত ইলেকট্রনকে দখল করে নেয়। এবং তৈরি করে এক একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর। (তোমরা অনেকেই তো জান, হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে থাকে একটি প্রোটন। আর তার চারপাশে পরিক্রমণ করে একটি ইলেকট্রন) এই হাইড্রোজেন ঊর্ধ্বাকাশের বায়ু-মণ্ডলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে জলের অণু। বিজ্ঞানীরা এই জলকে বলেন 'সোনার রেইন' বা সৌর বৃষ্টি। এই জন্যই ধূলিকণার সঙ্গে মিশে তৈরি করে নিশিদীপ্ত মেঘ।

প্রশ্ন হল, এই জল কি তা হলে শুধু পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধের কাছাকাছিই শুধু তৈরি হয়? নিশিদীপ্ত মেঘ যখন ওই অঞ্চলেই দেখা যায়, সে রকমটাই হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

এ প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বলছেন, সূর্য থেকে যে প্রোটন কণার বর্ষণ ঘটে, তার বেশির ভাগ ঝরে পড়ে পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি অঞ্চলে। এর জন্যে দায়ী পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ চৌম্বক মেরু।

উত্তর একটা পাওয়া গেল ঠিকই। কিন্তু প্রশ্নও থেকে যাচ্ছে সেই সঙ্গে। বছরের বিশেষ একটি সময়েই বা এই মেঘ দেখা যায় কেন? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর এখনও জানা যায় নি।

বিজ্ঞান সংবাদ

বাংলা বিজ্ঞান লেখক সম্মেলন

বাংলায় বিজ্ঞান সাহিত্যকে যথার্থ ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিজ্ঞান লেখক ও আগ্রহীদের নিয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছে গোবরডাংগা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে কলিকাতার বিড়লা সংগ্রহশালায়, ফেব্রুয়ারী মাসে। এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখকগণ উপস্থিত থাকবেন। এবং একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা হবে। যাঁরা লেখা পাঠাতে চান ও যোগাযোগে আগ্রহী, নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করুন। দীপকদাঁ. আহ্বায়ক গোবরডাংগা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট পোঃ—খাঁটুয়া, জেলা—২৪-পরগনা

বিজ্ঞান ক্লাব সম্মেলন

৩য় সর্বভারতীয় বিজ্ঞান ক্লাব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বর্দ্ধমান, কাটোয়া কলেজে, বিজ্ঞান পরিষদের আতিথ্যে। পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৫০টি বিজ্ঞান ক্লাব এতে অংশ নেবে। ২৯, ৩০ ও ৩১শে ডিসেম্বর '৮১—সম্মেলন হবে। সব বিজ্ঞান ক্লাব ও বিজ্ঞান অনুরাগীদের এই সভায় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করেছেন আহ্বায়ক ডঃ কালীচরণ দাস।

বিজ্ঞান সেমিনার

গ্রামীণ সম্পদের ব্যবহার ও বিকল্প শক্তির উৎস এই প্রসঙ্গে আগামী ষষ্ঠ নিখিলবঙ্গ শিল্প ও বিজ্ঞান শিবিরে দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল তিনদিন ব্যাপী একটি সেমিনারের আয়োজন করেছে ৫-৮ ফেব্রুয়ারী '৮২ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এই সেমিনারে বিভিন্ন গ্রামীণ সম্পদকে কিভাবে সঠিক কাজে লাগানো সম্ভব তা হাতেকলমে দেখানো হবে এবং বিকল্প শক্তি সম্বন্ধে সাধারণের জন্য কিছু কিছু মডেল ও তিনদিনব্যাপী আলোচনা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দিয়ে পরিচালনা করা হবে। প্রবেশ মূল্য ৩৫ টাকা।

সম্পাদক, দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল ১০৪, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা-৮ ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে আবেদন পাঠাতে হবে। (নিজস্ব প্রতিবেদক)

ধারাবাহিক উপন্যাস

শার্লক হোমস প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এবং মঙ্গলগ্রহ

অদ্রীশ বর্ধন

[দশ]

আপাততঃ তোমার খাদ্যের দরকার। এই দোকানে প্রচুর বিস্কুট আর টিনে খাবার আছে। পকেট ভর্তি করে নিয়ে রওনা হও বার্মিংহ্যামের দিকে।

টপ করে চোয়াল বন্ধ করে হপকিন্স। বললে, কাতর কণ্ঠে—"বার্মিংহ্যাম!"

"অত আঁতকে ওঠার কি আছে।"

"একশ মাইলেরও বেশী পথ—হেঁটে যাব?"

"লণ্ডনের বাইরে একবার গিয়ে পড়লে পথেঘাটে ঘোড়া কি অন্য যানবাহন পেয়ে যাবে। সে ভাবনা তোমার। কিন্তু বার্মিংহ্যাম তোমাকে যেতেই হবে—এই চিরকুট নিয়ে।"

"আর আপনি? এই ভয়ংকরদের মধ্যে থাকবেন?"

"হপকিন্স, থাকতে আমাকে হবেই। এদের মধ্যে থেকে এদেরই ত্রুটি অন্বেষণ করতে হবে—প্রাণ হাতে নিয়ে সেই কাজই করে যাব দেশের স্বার্থে—পৃথিবীর স্বার্থে।"

এরপর তার কথা বলা চলে না। হপকিন্স প্যান্টের আর কোটের পকেটে বেশ কিছু টিনের খাবার ঠেসে নিয়ে শুকনো মুখে রওনা হল বার্মিংহ্যাম অভিমুখে।

শার্লক হোমস্ বেরোলো রোদে। জনহীন লণ্ডন শহরের পথেঘাটে অতি সন্তর্পণে চোরের মত ঘুরতে লাগল নতুন সূত্রের আশায়।

একটা সূত্র অবশ্য পাওয়া গেছে। মোক্ষম সূত্র।

লাল ফুলেদের মৃত্যু। পৃথিবীর হাওয়ায়, তাদের জন্মেই মরণের কোলে ঢলে পড়া। মঙ্গলের প্রাণ যখন পৃথিবীতে এসে নিষ্প্রাণ হয়ে যায়, তখন...

আচমকা সজাগ হল শার্লক হোমস্। রাস্তার মোড়ে দেখা গেল একটি নরদেহ। হাতে উন্মুক্ত কৃপাণ। টলতে টলতে আসছে এইদিকেই।

সাঁৎ করে পাশের মনোহারী দোকানে ঢুকে পড়ল হোমস্। বিরাট দোকান। কাঁচের শো-কেসের পর শো-কেস। থরে থরে সাজানো টিনের খাবার, প্রসাধন দ্রব্য এবং বিবিধ সামগ্রী।

ফুটপাথ থেকে পায়ে পায়ে পিছু হটে এসে এই দোকানের ভেতরেই এসে দাঁড়াল হোমস্।

কিন্তু উৎকর্ণ কর্ণরন্ধ্রে ভেসে এল দ্রুত ধাবমান পদশব্দ। কৃপাণ হাতে টলায়মান পুরুষটি ছুটে আসছে এইদিকেই। মুহূর্তের মধ্যে খোলা দরজার সামনে আবির্ভূত হল সে। কৃপাণ উঁচিয়ে বললে শ্লেষ্মা জড়িত ঘড়ঘড়ে গলায়—শার্লক হোমস্। এবার তোমাকে একা পেয়েছি।...

আরো কয়েক পা পেছিয়ে গিয়ে সকৌতুকে বললে শার্লক হোমস্—মর্স হাডসন যে। আমি তো ভেবেছিলাম আমি একাই বুঝি রইলাম পড়ে পুরোনো এই শহরে। বড্ড একা লাগছিল। বাঁচলাম তোমাকে পেয়ে।"

"বাঁচাচ্ছি, শয়তান কোথাকার।" চৌকাঠ পেরিয়ে আরো দু'পা ভেতরে অগ্রসর হল হাডসন—মার্থা হাডসন কোথায়?"

দু'পা পেছিয়ে গিয়ে একটা টুলের পাশে দাঁড়িয়ে হোমস্ বললে—মার্থা? মানে, মিসেস হাডসন? আমার ল্যাণ্ডলেডী?"

"হ্যাঁরে রাস্কেল! আমার বিয়ে করা বউ। কোথায় সে?"

"ব্রাদার হাডসন, ছ'জন নেপোলিয়নের মূর্তি নিয়ে যে কেলোর কীর্তি হয়েছিল, তোমার শ্রীঘর অনিবার্য ছিল সেই কেসে। এখনো দেখছি তোমার আক্কেল হয়নি। রাস্কেল বলাটা কি ঠিক হচ্ছে?..."

'...শয়তান! বল্ কোথায় রেখেছিস্ মার্থাকে? কাল থেকে দেখছি তোকে—সঙ্গে ছিল ঐ ন্যাওটা হপকিন্সটা। আজ তোকে পেয়েছি একা, বল্—কোথায় রেখেছিস মার্থাকে?'

"হাডসন, মিসেস হাডসন তোমার বিয়ে করা বউ ঠিকই, কিন্তু ফেলেপালানো বউ। পুলিশের ভয়ে তুমি নিরপরাধিনী মেয়েটাকে অনাহারে রেখে গা-ঢাকা দিয়েছিলে, আমিই তাকে

লণ্ডনে এনে বাড়ী কিনে ল্যাণ্ডলেডী বানাই—বাড়ী ভাড়ার টাকায় যাতে সংসার চলে যায়, তাই ওপরতলাটা ভাড়াও নিই ওয়াটসনের সঙ্গে। কিন্তু কাকপক্ষী এই বদান্যতার কথা জানে না—"

"আমি জানি, কুত্তার বাচ্ছা। নিকুচি করেছে তোর বদান্যতার। বল কোথায় ফের লুকিয়েছিস মার্থাকে ?..."

"খুব ভাল জায়গায়। যেখানে তোমার মত নচ্ছার কেন —মঙ্গলগ্রহীদের ঐ যন্ত্রদানবও পৌঁছোতে পারবে না।"

'কোথায় ?"

"বলব না।"

"না বললে মরবি।"

"মরলেও ঠিকানা পাবে না।"

"তবুও মর !" বলেই ক্ষিপ্রবেগে ফিরে এসে হোমসের মাথা লক্ষ্য করে কৃপাণ চালালো হাডসন।

হোম্‌স্‌ও তৈরী ছিল। পলক ফেলার আগেই পাশের টুল হাতে উঠে এল এবং কৃপাণটা ঘ্যাঁচাৎ করে বসে গেল টুলের কাঠে।

হাডসনের শ্লেষ্মা-ঝরা মুখের কাছ থেকে মুখটা সরিয়ে নিয়ে মোলায়েম গলায় হোম্‌স্‌ বললে—"বড্ড সাঁদ লেগেছে দেখছি।"

এক হ্যাঁচকায় কৃপাণ ছাড়িয়ে নিয়ে আবার হোমসের মাথা লক্ষ্য করে কোপ মারল হাডসন। এবার কিন্তু পিচ্ছিল ভঙ্গিমায় একপাশে সরে গিয়ে হোম্‌স্‌ শুধু বললে—অত চেঁচিও না, মঙ্গলগ্রহের শান্ত্রীরা শুনতে পাবে।

হোমসের প্রখর কর্ণযন্ত্র আগেই যা শ্রবণ করেছিল এখন তা স্পষ্টই শোনা গেল কথা শেষ হতে না হতে। ঝনাৎ... ঝন্‌...ঝন্‌...ঝনাৎ...ঝন্‌...ঝন্‌।

ধাতুতে ধাতু ঠুকে কারা যেন এগিয়ে আসছে এই দিকে।

চাপা গলায় হোমস বললে—"নির্বোধ কোথাকার ! কৃপাণ উঁচিয়ে বেপরোয়াভাবে ধেয়ে এসেছিলে যখন তখনই তোমাকে দেখেছে ওরা। এখনও চেঁচাচ্ছো ষাঁড়ের মত গাঁক গাঁক করে !..."

"শাট আপ !" গলার শির তুলে চেঁচিয়ে উঠে হোম্‌স্‌কে লক্ষ্য করে ছুটে এল হাডসন। বিদ্যুৎগতিতে হোম্‌স্‌ একটা শো-কেস থেকে আরেকটা শো-কেসের আড়ালে সরে গেল বলেই রক্ষে, নইলে কচুকাটা হয়ে যেতে হত হাডসনের মুহুর্মুহু কৃপাণ-চালনায়। কৃপাণ আঘাতে ঝন্‌ঝন্‌ করে গুঁড়িয়ে গেল একটা শো-কেস।

ঝনাৎ-ঝন্‌-ঝনাৎ শব্দটা স্তব্ধ হল দোকানের ঠিক সামনেই। বিশাল বয়লার সদৃশ যন্ত্রদেহ হেঁট হল দোকানের অভ্যন্তরের দৃশ্য ভালভাবে দেখবার জন্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অজগরের মত একটা মোটা শুঁড় ধেয়ে এল ভেতরে।

হাডসন অশ্লীল গালাগালি দিয়ে কৃপাণ চালালো সেই শুঁড় লক্ষ্য করে—ঠনাৎ শব্দে ধাতব শুঁড়ে কৃপাণ লেগেই হাত থেকে ঠিকরে গেল শূন্যে এবং চোখের পলক ফেলার

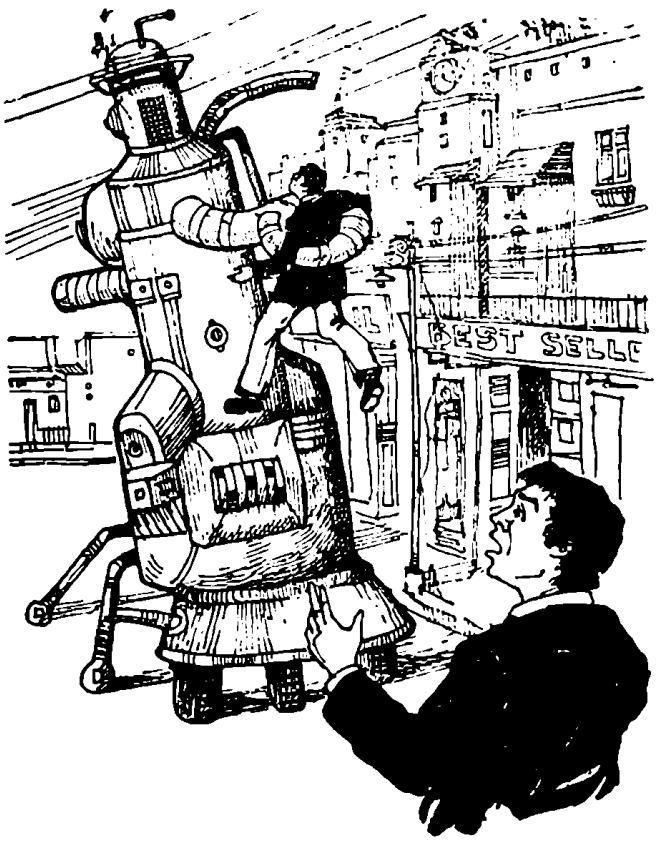

আগেই শুঁড়টা ঠিক অজগরের মতই হাডসনকে পেঁচিয়ে ধরে অবলীলাক্রমে তুলে নিল শূন্যে এবং শূন্যেই—একবার দুলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে।

হাডসনের বিকৃত আর্তনাদ শোনবার জন্যে কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল না হোম্‌স্‌। হাতের কাছে খাবার দাবার যা পেল, ঝটপট পকেটে পুরে সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল পেছনের দরজা দিয়ে। সেখান থেকে একটা সরুগলি দিয়ে পেছনের রাস্তায় যেতে যেতেই পেছন ফিরে দেখতে পেল শুঁড়টা দোকান থেকে শো-কেস ভেঙে টিনের খাবার লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে বাইরে। রাস্তায় বেরিয়ে আসতে না আসতেই প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে পড়ল বাড়ীর সামনের দিকটা। যন্ত্র দানবের ধাক্কা বোধহয় সইতে পারল না।

হোম্‌স্‌ তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োচ্ছে। এ-রাস্তা সে-রাস্তা

ছুটে দৌড়োতে দৌড়োতে শুনতে পেল হাডসনের বিকট আর্তনাদ আর ধাতব ঝনৎকার।

দূরের মোড় ঘুরে অদৃশ্য হল একটা দানব দেহ পিঠের থাঁচায় আকুলি বিকুলি করছে মর্স হাডসন!

আর ডাকছে পরিত্রাহি স্বরে—"হোম্‌স্! হোম্‌স্! হোম্‌স্!"

শুষ্ক কঠিন চোখে নিষ্পলকে চেয়ে রইল শার্লক হোমস্।

মানুষ নিয়ে কোথায় চলেছে মঙ্গলগ্রহী? ল্যাবোরেটরীতে গিনিপিগের মত কেটে কুটে এক্সপেরিমেণ্টের জন্য? না রান্নাঘরে?

[১১ অদৃশ্য সেনানী]

পরের দিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই আগে ছাদে গিয়ে লণ্ডনের অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করে নিল হোম্‌স্। চারদিক থমথম করছে। পাখীগুলো পর্যন্ত যেন বুঝেছে এ শহর তার পার্থিব জীবেদের কবলে নেই—মহাপাপিষ্ঠ অপার্থিবরা নারকীয় তাণ্ডবে মত্ত হয়েছে পথেঘাটে এমন কি আকাশেও। কাজেই আকাশবিহার স্থগিত রেখে বৃক্ষশাখার বাসায় টু-লেট ঝুলিয়ে বিহঙ্গকুল পর্যন্ত চম্পট দিয়েছে।

অথবা, থেকেও বোবা হয়ে রয়েছে—বিষম আতংকে। অবাক মানসগোচর সত্তা দিয়ে তারাও বুঝেছে, ভিনগ্রহী এই আতংকদের কাছে পৃথিবীর সব জীবই শত্রু।

তাই, ভোরের লণ্ডন শুধু ধূমহীন নির্মল নয়—নীরব নিস্তব্ধ। সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে পাখীরা বিরামবিহীন যে গান গেয়ে ঘুম ভাঙিয়েছে মানব সমাজের—সে গান আর শোনা যাচ্ছে না।

এরই নাম কি মহাশ্মশান?

দু'চোখ বুঝি সজল হয়ে এল শার্লক হোমসের।

আচম্বিতে প্রিমরোজ হিলের দিক থেকে ধাতব কণ্ঠস্বরে নৈঃশব্দ্য খান্ খান্ করে দিয়ে রণনিনাদ ছাড়ল একটা মেট্যাল দৈত্য। ভোরের সূর্যও ঠিকরে গেল, ধাতব দেহ থেকে। স্টীম সাইরেনের মত কানের পর্দা ফাটানো তীব্র শব্দও শোনা গেল দিকে দিকে। কিন্তু—

অত্যন্ত সজাগ এবং প্রখর শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিকারী বলেই শার্লক হোমসের মনে হল, এই জয়ধ্বনি যেন আগের শোনা জয়ধ্বনির মত নয়, বেহালার মূর্চ্ছনা যাকে অভিভূত করে, সুরের ইন্দ্রজাল যে সূক্ষ্মসত্তা দিয়ে অনুভব করে—সেই শার্লক হোমসের কানে এ-টুকু তারতম্য ধরা পড়া একান্তই স্বাভাবিক।

তাই খটকা লাগল হোমসের মনে।

সারা দিনে মাঝে মাঝে শোনা গেল দূরায়ত স্টীম-সাইরেনের ধ্বনি। ধাতুর বুক চিরে যেন বেরিয়ে আসছে সেই শব্দ। কিন্তু সঞ্চরমান কোনো ধাতব দানবকে দেখা গেল না দিগন্তের কোনোদিকেই, সন্ধে নাগাদ গোধূলির রক্তিমাভায় একবার কেবল ঝিলিক দিয়ে উঠল একটা ধাতব দেহ প্রিমরোজ হিলের ওপর।

রাত নামল। বাতি জ্বালল না হোম্‌স্। বরং বেহালা নামিয়ে খুব আলতো করে টেনে বিচিত্র সুরের জাল বুনে চলল আপন মনে।

রোববার সকালে ঘুম ভাঙার সঙ্গে মনে পড়ল, দশম চোঙা কাল রাতেই নেমেছে পৃথিবীতে—নিশ্চয় লণ্ডনেরই ধারে কাছে। ওদের বাহিনী এখন সম্পূর্ণ। পঞ্চাশজন মঙ্গলগ্রহী তাদের সমস্ত সাজসরঞ্জাম নিয়ে হাজির লণ্ডনে। সে তুলনায়, কিন্তু সাজ সাজ রব শোনা যাচ্ছে না আকাশে বাতাসে অথবা, পথেঘাটে। লণ্ডন আরও ঝিমিয়ে পড়ছে। শার্লক হোম্‌স্‌ও কি ঝিমিয়ে পড়ছে? চোখ গেল ম্যাণ্টলপিসে রাখা কোকেন মারফিনের শিশি আর হাইপোডারমিক সিরিঞ্জের দিকে। নিজেকে নিস্তেজ মনে করলেই, বাইরের উত্তেজনার অভাব দেখা দিলেই রক্তের মধ্যে ছুঁচ দিয়ে মাদক দ্রব্য মিশিয়ে কৃত্রিম উত্তেজনার সৃষ্টি করে এসেছে হোম্‌স্ এত কাল, কিন্তু এখন আর তার দরকার নেই। লণ্ডন ঝিমিয়ে পড়ে পড়ুক, শার্লক হোম্‌স্ ঝিমিয়ে নেই।

রাস্তায় বেরোলো হোম্‌স্। বেকার স্ট্রীট খাঁ-খাঁ করছে। সাবধানে মোড় ঘুরে অলিগলি দিয়ে পৌঁছলো রিজেণ্ট পার্কে, একটা ঝাঁকড়া গাছের তলায় কি যেন পড়ে আছে। ধাতব দেহ। দূর থেকে দেখেই থমকে গেল হোম্‌স্।

আর ঠিক তখনি ভক্ করে খানিকটা সবুজ ধোঁয়া ঠেলে উঠল গাছের ফাক দিয়ে—ঠিক যেমনটা দেখা গিয়েছিল ওকিংয়ে নীল বিদ্যুৎ নিক্ষেপের পূর্ব মুহূর্তে।

কাঠ হয়ে গেল হোম্‌স্।

কিন্তু পলায়নের আগেই শোনা গেল অদ্ভুত সেই চিৎকারটা।

পার্থিব ভাষায় যার নাম গোঙানি, এ যেন তার চাইতেও তীব্র কিছু। ধাতুর বুক চিরে বেরোনো শব্দ নয়, স্টীম সাইরেনের মত বুকের রক্ত ছলকানো শব্দও নয়। এ শব্দ যেন প্রাণীর।

হ্যাঁ, কোনো সন্দেহই নেই। জীবন্ত প্রাণীর কণ্ঠ নিঃসৃত সেই চিৎকার, আর যাই হোক বিজয়োল্লাস নেই—আছে যেন অন্তিম হাহাকার। শব্দটা একবার শোনা গেল,—দু'বার শোনা গেল। তৃতীয়বার শব্দ নয়—ভক্ করে আবার সেই

সবুজ ধোঁয়া লুণ্ঠিত ধাতব দেহের ওপরে ঠিকরে গেল—দেহটা কিন্তু নড়ল না।

মেশিন পড়ে রইল গাছের তলায়।

দ্রুত পেছনে সরে এল হোম্‌স্‌। তারপর পেছন ফিরেই পিঠটান দিয়ে গলির মধ্যে।

পেছন থেকে অপার্থিব কণ্ঠে কেউ হুঙ্কার দিল না, রক্ত হিম করা ধাতব নিনাদে হৃৎপিণ্ড অসাড় করে দিল না। একরকম ছুটতে ছুটতে বেকার স্ট্রীটে বাসায় ফিরে হোম্‌স্‌ জল গরম করে চা বানিয়ে বিস্কুট দিয়ে দুপুরের খাওয়া শেষ করে ভাবতে বসলেন সকাল বেলাকার দেখা দৃশ্যটা নিয়ে। তবে কি তার অনুমানই শেষ পর্যন্ত সত্যি হল? ধুকতে শুরু করেছে মঙ্গলের আগন্তুকরা? লাল ফুল মরে বাদামী হয়ে যাচ্ছে দেখেই সন্দেহ হয়েছিল হোমসের। সেই তার প্রথম সূত্র। সেই সূত্রের বশেই শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলার পথ-নির্দেশ পাঠিয়েছিল বার্মিহামে। দেখা যাচ্ছে, শেষ ঘনিয়ে আসছে খুব দ্রুত।

বিচিত্র নয়। জীবাণু সহনশীলতা, না থাকার ফলে আমেরিকার শ্বেতকায়দের সংস্পর্শে এসে পাষাণ—দেহী ইণ্ডিয়ানরা হাম আক্রান্ত হয়ে দলে দলে নিকেশ হয়ে যায় নি? দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে দ্বীপে দ্বীপে স্রেফ সর্দির জীবাণু কাতারে জংলী দ্বীপবাসীকে পরলোকে পাঠায়নি?

হাডসনও লণ্ডনের শীতের রাতে ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসেছিল বুকভরা শ্লেষ্মা নিয়ে নাকে মুখে সর্দি ঝরিয়ে উঠেছিল মঙ্গল গ্রহীদের খাঁচায়। অত্যন্ত পাজী এই সর্দির জীবাণুর অদৃশ্য সেনানী হিসেবে কি আক্রমণ করেনি মঙ্গলগ্রহীদের?

কিন্তু ওয়াটসন এখন কোথায়? বেঁচে আছে তো? ওর জন্যে লেখা চিঠি এখনো ছুরি-গাঁথা অবস্থায় পড়ে আছে ম্যাণ্টলপিসে।

দূর থেকে অন্তিম কাতরানি, আবার শোনা গেল প্রাণী কণ্ঠের চিৎকার—যদি কণ্ঠ বলে কিছু থাকে অক্টোপাসের মত বিকট দেহী আততায়ীদের।

বন্ধু, বহুদূর থেকে উড়ে এসেছিল পৃথিবী জয়ের স্বপ্ন নিয়ে। সে স্বপ্ন এখন ধূলিসাৎ। হোম্‌স্‌ এখন নিঃসন্দেহ। অদৃশ্য জীবাণুরা পাহারা দিচ্ছে পৃথিবীকে। মঙ্গলের আগন্তুকরা একে একে ঘায়েল হচ্ছে তাদেরই হাতে।

পায়ের চটিজুতো থেকে তামাক বার করে চেরী পাইপে ঠাসতে ঠাসতে হোম্‌স্‌ ভাবল···আঃ, ওয়াটসন। এই সময়ে···দড়াম করে খুলে গেল দরজা। ঘরে ঢুকল ওয়াটসন।

(ক্রমশ :)

ছোটদের জন্যে ভাল বই

● **জানোয়ার**
লীলা মজুমদার—যুক্তাক্ষর বর্জিত ছোটদের জন্য সত্যকাহিনী—শৈল চক্রবর্তীর দু-রঙের ছবি। [৪·৩০]

● **মজার ছড়া**
ভবানীপ্রসাদ মজুমদার—তাপস দত্তর দু-রঙের ছবি। [৫·০০]

● **মজার কবিতা**
উপেন্দ্রচন্দ্র মাল্লক—শৈল চক্রবর্তীর দু-রঙের ছবি। [৫·০০]

● **ছড়ার দেশে টুলটুলি**
শৈল চক্রবর্তীর লেখা—ও দু-রঙের আঁকা ছবি। [৬·০০]

● **শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে**
শশিভূষণ দাশগুপ্তর ছড়া—তাপস দত্তর ছবি। [৫·০০]

● **কুমির সাহেব**
প্রেমেন্দ্র মিত্রর ছড়া—তাপস দত্তর ছবি। [৩·০০]

● **টুনটুনির গল্প**
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—সমর দে-র ছবি। [৪·০০]

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ—৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

সমুদ্রপথের সাথী অ্যালবাট্রস

প্রদীপকুমার দাস

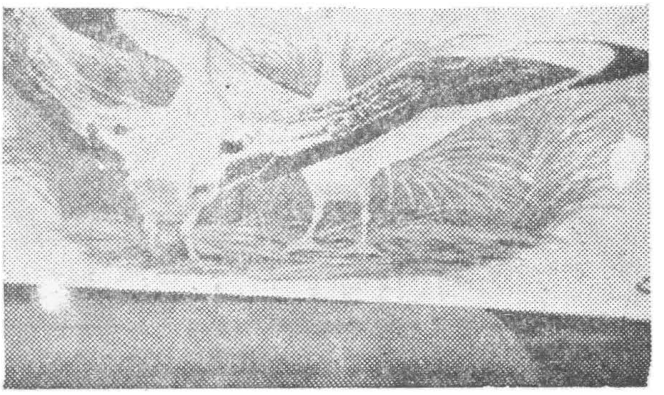

সমুদ্রবক্ষে ভেসে চলেছে যাত্রীবাহী জাহাজ। চারিদিকে শুধু নীল জলরাশি। মাথার উপরে নীল আকাশ। সেই নীল আকাশের বুকে উড়ে চলেছে এক ঝাঁক পাখী। অ্যালবাট্রস, নিঃসঙ্গীদের পরম বন্ধু। সঙ্গ দান ছাড়াও চরম বিপদের সম্মুখীন নাবিকের বার্তাও বহন করে, পরিচয়ে সামুদ্রিক পাখী। ডায়োমিডি পরিবার ভুক্ত। সমুদ্র উপকূলবর্তী ছোট ছোট দ্বীপগুলো এদের নীড়। আকাশপথে পাড়ি দেয় দলগত ভাবে। দল ছাড়া কখনো একা থা কে না। মিশুকে। বন্ধুত্ব পাতায় সদুদ্র-যাত্রীদের সঙ্গে। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে নাবিকরা দিক্-ভ্রান্ত হলে, পথের নির্দেশ দেয়। দেহ-সৌন্দর্যে অতি মনোরম। লম্বা ও সরু পাখনা দিয়ে দ্রুত-গতিতে বাতাস কেটে এগিয়ে যেতে পারে। এদের গতির সঙ্গে পেরে উঠে না অতি দ্রুতগামী জাহাজ। প্রকৃতিসৃষ্ট এই পাখীগুলো আবার ভূপৃষ্ঠে অত্যন্ত শ্লথ ও বেমানান। তাই ইংরেজ নাবিকদের কাছে এদের পরিচয় বোকা-পাখী'। উত্তর আট-ল্যান্টিক ছাড়া সব সমুদ্রে দেখতে পাওয়া যায়। সামুদ্রিক জলজ প্রাণীই এদের খাবারের তালিকাভুক্ত। সমুদ্রের নোনা জল এদের পানীয়। সারা দেহ নরম পালকে ঢাকা। শীতের দিনে পালকের আচ্ছাদনই এদের দেহকে গরম রাখতে সাহায্য করে। এদের পাখনাগুলো খুবই লম্বা ও ধারালো।

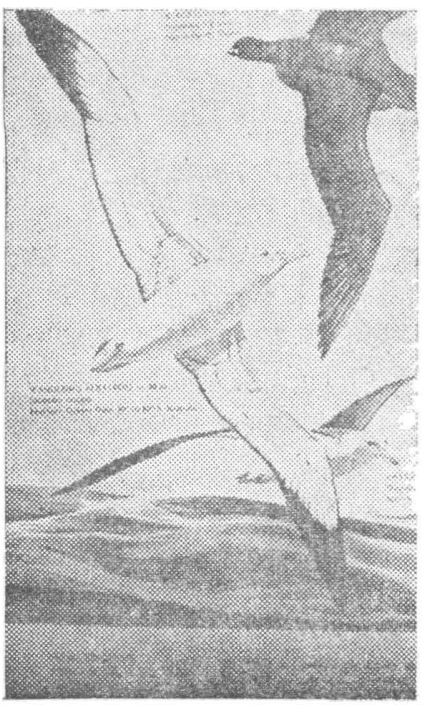

চঞ্চুটি চার ইঞ্চিরও বেশি লম্বা, ও খুব সরু। এর অগ্রভাগটি বঁড়শীর কাঁটার মত বাঁকানো। চঞ্চুর দুই পাশে রয়েছে দুটি নাসিকাছিদ্র। এদের প্রত্যেকটি পায়ের পাতাই ঢেউ খেলানো। শেষের পাতাটি থাবার কাজ করে। ডিম পাড়ে এরা একটা করে। ডিম থেকে ছানা ফুটতে সময় লাগে প্রায় দু-মাস, পূর্ণাঙ্গ পাখীর রূপ নিতে সময় লাগে আরও চার-পাঁচ মাস। এই সময়ে ছানা বাঁসায় একা একা কাটায়। বাবা-মা সেই সময় ব্যস্ত থাকে খাবারের খোঁজে।

অ্যালবাট্রস পাখীগুলো তেরটি বিভিন্ন প্রজাতিভুক্ত। এদের মধ্যে কালো অ্যালবাট্রস পাখীগুলো আকৃতিতে সব থেকে ছোট। গায়ের রঙ গাঢ় ধূসর বর্ণের। পা ও পায়ের পাতা কালো রঙের। ডানাগুলো লম্বায় ৭ ফুট। বাসস্থান উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী দ্বীপ-গুলোতে। এদের সব থেকে বেশি দেখা যায় উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলবর্তী দ্বীপগুলোতে। এরা একটানা পাঁচ-ছয় মাইল আকাশে উড়তে পারে। আর এক ধরনের অ্যালবাট্রস আছে যারা একটানা আকাশ পথে প্রায় ছয় হাজার মাইল বিচরণ করতে পারে। এরা সাধারণতঃ সমুদ্রগামী কোন জাহাজকে অনুসরণ করে একসঙ্গে অনেকে আকাশ পথে ভেসে বেড়ায়, সে সময় নাবিকের কাছে এরা পরম বন্ধু। ঐ ধরনের অ্যালবাট্রস পাখীগুলো আকারে অনেক বড়। এদের ডানাগুলো লম্বায় এগার ফুট। লেসান অ্যালবাট্রসও দেখতে অতি সুন্দর। সারা দেহটা সাদা রঙের, কেবলমাত্র পিঠের দিক ও ডানার রঙটি কালো। এরাও আকৃতিতে বড়। তবে আকাশপথে বেশিদূর বিচরণ করতে পারে না। কালো ও লেসান পাখীগুলোর আর একটা বড় গুণ আছে। এরাও আমোদ-প্রমোদ করতে জানে। তাই যখন মাটিতে থাকে, একসঙ্গে মিলে নৃত্য করে অবসর সময় কাটায়। এদের সম্বন্ধে মধ্যে বহুদিন ধরে প্রচলিত রয়েছে এক অন্ধ-বিশ্বাস। এরা নাবিকদের কাছে শুভযাত্রার প্রতীক।

ইনটারনী, নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ, কলি-১৪

সূতাকাটার কল

সুধাংশু পাত্র

জন কে, নামে ছিলেন এক তাঁত চালক। কাপড় বুনতেন এবং অল্পায়াসে কেমন করে বেশি কাপড় বুনতে পারা যায়—এই নিয়ে অবসর সময়ে গবেষণাও করতেন।

একদিন তাঁর প্রচেষ্টা সার্থক হল। আবিষ্কার করলেন এক নতুন ধরনের তাঁত। তাতে তিনি একাই দশজনের সমান কাপড় বুনতে আরম্ভ করলেন।

কথাটা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কেউ কেউ তাঁর বাড়ীতে এসে শিখে গেল সে পদ্ধতি এবং দেখতে দেখতে জনপ্রিয়ও হয়ে উঠল। কিন্তু বেশির ভাগ তাঁত চালক রুষ্ট হয়ে উঠল তাঁর উপর। ভাবল ঐ লোকটার জন্যই তাদের জীবিকা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই একদিন দল বেঁধে ঘেরাও করল তাঁর বাড়ী এবং ঘর-দোর, জিনিসপত্র, সব ভেঙ্গে চুরে একাকার করে দিয়ে গেল। বলাবাহুল্য, কে'র আবিষ্কৃত নতুন তাঁতটি ভেঙ্গে ছিল সর্বাগ্রে। তাঁতখানা ওরা ভেঙ্গে দিলেও তাঁতের জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র হ্রাস পেল না। সুযোগ সন্ধানীরা একেবারে লুফে নিল তাঁর পদ্ধতি। দেখতে দেখতে জন কে'র তাঁত ভরে গেল সারা ইংলণ্ড।

এবার এক সমস্যা দেখা দিল। উন্নত তাঁত চালু হল বটে কিন্তু উন্নত ধরনের সূতাকাটার কল আবিষ্কৃত হল না। তাই চারদিক থেকে রব উঠল—"চাই সুতো" "চাই সুতো"।

রিচার্ড আর্করাইট নামে এক ভদ্রলোক নাপিতের কাজ করতেন। অবস্থা আদৌ ভাল ছিল না। দিন আনতেন, দিন খেতেন। ভাবলেন, নাপিতের ব্যবসা করতে থাকলে জীবনে উন্নতি কোনদিনই হবে না। জন কে. উন্নত তাঁত আবিষ্কার করেছেন আর তিনি যদি সূতাকাটার কল আবিষ্কার করতে পারেন তাহলে উন্নতি ঠেকায় কে?

ভাবা মাত্রই আরম্ভ করে দিলেন কাজ! নাপিতের ব্যবসা একেবারে বন্ধ করে দিলেন। নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়ে এটা ওটা নিয়ে মেতে উঠলেন গবেষণায়। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে গবেষণা চালানোর মত আর্থিক সঙ্গতি আর্করাইটের ছিল না। তবে হার মানলেন না তিনি। বাজার থেকে করাত, বাটালি, হাতুড়ি ইত্যাদি কিনে এনে নিজেই নির্মাণ করে নিলেন প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি।

এদিকে নাপিতের কাজ বন্ধ করে দেওয়ায় সংসারে দেখা দিল অভাব। 'গরিবের ঘোড়া রোগ' দেখে রাগে জ্বলে উঠলেন আর্করাইটের স্ত্রী। কয়েকদিন ধরে খুব করে বকাঝকা করলেন। তাতেও যখন কাজ হল না তখন মারমুখী হয়ে একদিন প্রবেশ করলেন আর্করাইটের ঘরে। যেখানে যত যন্ত্রপাতি ছিল—সব ভেঙ্গে চুরমার করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, ঐ যন্ত্রপাতি গুলি যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ নড়বেন না আর্করাইট। নষ্ট করে ফেললে পুনরায় তিনি মন দেবেন নাপিতের কাজে।

আর্করাইটের স্ত্রীর উদ্দেশ্য কিন্তু সফল হল না। গবেষণাপাগল আর্করাইট কয়েকদিন বসে রইলেন গুম হয়ে। কারও সঙ্গে কথাটি পর্যন্ত বললেন না। শেষে অবশিষ্ট ভাঙ্গা চোরা যন্ত্রপাতিগুলিকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে।

বাড়ী থেকে অল্প দূরে ছিল একটা ভাঙ্গা স্কুল বাড়ী। স্কুল সেখানে হত না আর পতনের ভয় থাকায় লোকজনও বড় একটা যেত না সেখানে। আর্করাইট দেখলেন, গবেষণার জন্য এমন ভাল জায়গা আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিরিবিলি। নেই কোন ঝুট ঝামেলা খাসা জায়গা যাকে বলে।

মনের সুখে যন্ত্রপাতি পেতে বসলেন আর্করাইট। কিন্তু স্ত্রীর চোখে ধুলো দিতে পারলেন না। পরদিনই হানা দিলেন এখানে। বেশ একচোট বকাঝকা করে মিটিয়ে নিলেন গায়ের ঝাল। কিন্তু আর্করাইটের মনে কোন বিকার দেখা গেল না। একটি কথার উত্তর দিলেন না তিনি।

আর্করাইটের স্ত্রী আর কী করবেন? ভাবলেন, লোকটা একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেছেন। সংসারে অভাব যথেষ্ট থাকলেও বাধ্য হয়ে দেখা-শোনা করতে হল তাঁকে।

দিন যায়। আর্করাইট রাতদিন মেতে থাকেন যন্ত্রপাতি নিয়ে। শেষে উদ্ভাবন করলেন বেশ কয়েকটি যন্ত্র। অদ্ভুত সেই যন্ত্রগুলি থেকে বার হতে লাগল ঘড়্ ঘড়্, ঠক্-ঠক্ শব্দ। রাত নেই, দিন নেই, যন্ত্রের বিকট আওয়াজ সবাইকে সচকিত করতে লাগল।

বিশ্রী সেইসব শব্দ শুনতে শুনতে প্রতিবেশীরা হয়ে উঠলেন বিরক্ত। অনেকে রাতে ঘুমাতেই পারলেন না। সে যুগে মানুষের সঙ্গে যন্ত্রের পরিচয় না থাকায় কেউ কেউ ভাবল, আর্করাইট পিশাচ-সিদ্ধ হয়ে উঠেছেন। রাতে তার কাছে নিশ্চয়ই ভূতের দল আনাগোনা করে। নৈলে লোকটা সারারাত ঘুমায় না কেন? কেনই বা মাঝরাতে অদ্ভুত সব শব্দ ভেসে আসে কানে?

ততদিনে আর্করাইট অবশ্য অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। যন্ত্র থেকে সবে বেরুতে আরম্ভ করেছে এক-টার বদলে অনেকগুলো সূতো। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর! একদিন প্রতিবেশীরা সদলবলে হানা দিল স্কুল ঘরে। যেখানে যত যন্ত্রপাতি ছিল, সব ভেঙ্গে তছনছ করে দিল। আর কপালে কেবল করাঘাত করতে লাগলেন আর্করাইট।

মনের দুঃখে আর্করাইট পরের দিনই ছাড়লেন স্কুলঘর। মনের বল কিন্তু আদৌ হারালেন না। পালিয়ে গেলেন লোকালয় ছেড়ে অনেক দূরে। এবার বাধা দিতে এগিয়ে এল না কেউ। মনের সুখে কেবল কাজই করে যেতে লাগলেন।

সৌভাগ্যলক্ষ্মী সত্য সত্যই একদিন প্রসন্না হলেন তাঁর প্রতি। হয়ত অধ্যবসায় ব্যর্থ হয় না বলে। হাতের পরিবর্তে জলের স্রোতকে কাজে লাগিয়ে একদিন আর্করাইট উদ্ভাবন করলেন এক ধরনের বিশেষ যন্ত্র—যার দ্বারা একই সঙ্গে অনেকগুলি সূতো পাওয়া গেল।

অতি অল্প দিনেই জনপ্রিয় হয়ে উঠল আর্করাইটের যন্ত্র। বহুলোকে তাঁর কাছে ছুটে এল "ওয়াটার ফ্রেম" কেনার জন্য। একেবারে হিমসিম খেয়ে যেতে হল আর্করাইটকে। তখন বাধ্য হয়ে ওয়াটার ফ্রেম তৈরী করার কারখানা খুলতে হল এবং একাজে নিয়োগ করতে হল বহু লোককে। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই আর্করাইট পরিচিত হলেন লণ্ডনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী হিসাবে।

এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের আর একজন আবিষ্কারক স্যামুয়েল ক্রোম্পটনের নামও করতে হয়। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন মিউল নামে আর একধরনের সূতাকাটার যন্ত্র। উক্ত যন্ত্রটি আবিষ্কার করতে গিয়ে তাঁকেও বরণ করতে হয়েছিল চরম দুঃখ। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রোম্পটনের! আবিষ্কারকের গৌরব অর্জন করলেও দারিদ্র্যের যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেন নি কোন দিনও। অথচ আর্করাইট আবিষ্কৃত ওয়াটার ফ্রেম অপেক্ষা তাঁর মিউল অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

পোঃ কালিন্দী, মেদিনীপুর

ইউক্যালিপটাস্ কী?

আরতি মুখার্জী

ইউক্যালিপটাসের আদি জন্মভূমি অস্ট্রেলিয়ায়। ও দেশে এই গাছকে বলে "আঠা গাছ"। এখন এই গাছ ইউরোপ, অ্যালজেরিয়া, মিশর, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আমেরিকা ও আমেরিকা-যুক্তরাজ্যের দক্ষিণেও দেখতে পাওয়া যায়। ইউক্যালিপটাস্ গাছ দেখতে অতি বিচিত্র ধরনের। এর পাতাগুলি সব সময়েই উল্টোদিকে ঝুলে থাকে। কাণ্ডটি অতি দীর্ঘ ও সরল, এগুলি বিশেষ বিশেষ জায়গায় জন্মায়। ইউক্যালিপটাসের বৃদ্ধি অতি দ্রুত হয়। এরা এক বছরে তেরো ফিট পর্যন্ত বাড়ে বলে জানা গেছে। কালিফোর্নিয়ায় এক একটি ইউক্যালিপটাস্ গাছ এক একটি দৈত্যের মতো বিরাট। অনেকের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০০ ফিটেরও বেশি।

ইউক্যালিপটাস্ গাছ অত্যন্ত উপকারী। এই গাছ আর্দ্র জলবায়ু অঞ্চলে জন্মায়, এদের প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। জলাভূমির আর্দ্রতা আকর্ষণ করে নেওয়ার ফলে মশা জন্মাতে পারে না। এইভাবে এরা ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে রীতিমত সাহায্য করে। মূল্যবান ইউক্যা-লিপটাসের তেল এই গাছের আর একটি বিশেষ অবদান। এই গাছের পাতার গায়ে কতকগুলি বিশেষ গ্রন্থি আছে। এই গুলির ভিতর খড়ের মত রঙের এক রকম তৈলাক্ত রস পাওয়া যায়। এর গন্ধ অনেকটা কর্পূর তেলের মত। এই তেল সর্দির পক্ষে বিশেষ উপকারী। অন্য অনেক ঔষধ হিসাবেও এই তেল ব্যবহার করা হয়। কিডনীর এবং স্নায়ুর উপরও এই তেলের যথেষ্ট প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

ইউক্যালিপটাস কাঠ খুব মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী। সেইজন্য জাহাজ তৈরীর জন্য এই কাঠের খুবই চাহিদা আছে। আবার এই কাঠের উপর পালিস্ ও ফিনিসিং এর কাজ খুব চমৎকার হয়। অস্ট্রেলিয়ায় ঘরের আস-বাবের জন্য এই কাঠের খুবই আদর। আমাদের দেশে বিহার, ছোটনাগপুর, জয়পুর, উদয়পুর প্রভৃতি অঞ্চলে ইউক্যালিপটাস্ গাছ পাওয়া যায়। অনেকে আবার বাগানের শোভার জন্যও এই গাছ রোপন করেন।

বাকুলিয়া হাউস, খিদিরপুর, কলিকাতা-২৩

মুক্তোর জন্মকাহিনী

হীরক দাশ

মুক্তো কি জিনিস তা হয়তো আর বলতে হবে না কারণ মুক্তো আমাদের এক পরিচিত বস্তু। আমাদের কাছে মুক্তোর বেশ মূল্য, কানের দুলে সোনার হারে বা আংটিতে মুক্তো বসিয়ে অলংকারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু এই মুক্তো কিভাবে জন্মায় সে কথাই এখানে তোমাদের বলবো।

পুরাকালে মুক্তোর জন্ম সম্পর্কে মানুষের অনেক হাস্যকর ধারণা ছিল। এ সম্পর্কে তারা বিশেষ কিছু জানতো না। কেউ কেউ মনে করতো, শিশির বিন্দু থেকেই নাকি এর জন্ম। আবার আরব দেশের লোকেরা বলতো, ঝিনুক খুব ভোর বেলায় জলের উপর ভেসে উঠে শিশির বিন্দু খায়। সেই সময় ঝিনুকের দেহের উপর সূর্যের আলো পড়ে এবং এই সূর্যের আলো আর বাতাসের প্রভাবে ঝিনুকের দেহের মধ্যকার শিশির বিন্দু আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে গিয়ে মুক্তো রূপে জন্ম নেয়। প্রায় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুক্তোর জন্ম নিয়ে মানুষদের মধ্যে এই রকমের অনেক আজগুবি ধারণা চালু ছিল। কিন্তু ওই শতাব্দীর শেষভাগে এক ফরাসী বিজ্ঞানী, নাম লিনে, অনেক গবেষণার পর মুক্তোর জন্ম সম্বন্ধে সঠিক কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে, ঝিনুকের খোলার মধ্যে যদি কোন 'উত্তেজক বস্তু' অর্থাৎ বালুকণা, কাঠের গুঁড়োর একটু দানা বা ছোট্ট একটি পাথরকুচি ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তবে সেটা বহুদিন পর মুক্তোয় পরিণত হবে। কথাটি সত্যি। এখনও এইভাবেই মুক্তোর জন্ম হয় সমুদ্রের তলায় এবং কৃত্রিম মুক্তোর চাষ এইভাবেই করা হয়।

ঝিনুক সমুদ্রের তলায় জলের মধ্যে যখন ঘুরে বেড়ায়, সেই সময় কখনো কখনো বালুকণা বা পাথরকুচির ক্ষুদ্র কণা হঠাৎ ঢুকে পড়ে ঝিনুকের শাঁসালো শরীরের মধ্যে। যেই না এভাবে ভেতরে ঢোকা ঝিনুক অমনি এক তরল পদার্থের স্তরের প্রলেপ দিয়ে ওই বালুকণাটাকে ঢেকে ফেলতে আরম্ভ করে। কারণ ঝিনুক নিজে থেকে ওই বালুকণাটাকে বাইরে বের করে দিতে পারে না এবং এভাবে থাকলেও ঝিনুকের নানান অসুবিধে ভোগ করতে হবে। কিন্তু ঝিনুক কিভাবে এই কর্মটি করে? ঝিনুকের মধ্যে মুক্তো যেখানে জন্মায় সে জায়গাটির নাম মুক্তো-থলে বা pearl-sack। এই মুক্তো-থলের মধ্যে উপস্থিত থাকে এক ধরনের কোষ। সংখ্যায় এরা কয়েক হাজার। কোন বালুকণা যখন ঝিনুকের দেহে প্রবেশ করে তখন সোজা এসে পড়ে এই থলের মধ্যে। ওই কোষগুলো তখন 'নেকার' (nacre) নামে এক রকমের পদার্থ নিঃসৃত করে যা ওই বালুকণাটির উপর স্তরে স্তরে প্রলেপ বসিয়ে দেয়। স্তরটা হয় পেঁয়াজের মতো—একটার উপর আর একটা। ব্যাস, এইভাবে কয়েক বছর থাকতে থাকতে ওই স্তরীভূত পদার্থটির তরল প্রলেপ কঠিন হয়ে জন্ম দেয় আসল মুক্তোর।

এই প্রাকৃতিক মুক্তো খুবই বিরল। কয়েক হাজার ঝিনুক থেকে মাত্র কয়েকটি মুক্তো পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইভাবে মুক্তো সংগ্রহ করে বিশ্বের বিপুল চাহিদা মেটানো যায় না। তাই অনেক বেশি করে মুক্তো পাওয়ার জন্য মানুষ মুক্তোর চাষ আরম্ভ করেছে। এখন সারা পৃথিবীতে এই কৃত্রিম মুক্তোর চাষ চলছে। কৃত্রিম মুক্তোর জন্ম হয় প্রায় প্রাকৃতিক মুক্তোর জন্মের মতোই। শুধুমাত্র বাইরে থেকে কৃত্রিম ভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় বালুকণা। তারপর সেই একই ভাবে জন্ম হয় কৃত্রিম মুক্তোর।

কৃত্রিম ভাবে মুক্তোর প্রথম চাষ করেন চীন দেশের এক ভদ্রলোক, নাম ই-জিন-ইয়াং। তবে এঁর চাষের মুক্তো খুব একটা উজ্জ্বল হয় নি। প্রথম উৎকৃষ্ট এবং আসল মুক্তোর মতো উজ্জ্বল কৃত্রিম মুক্তোর চাষের কৃতিত্ব দেখালেন কোকিচি মিকিমাটো নামে এক জাপানী ভদ্রলোক। উনি মুক্তোর চাষ করেন এগো উপসাগরে এবং হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করে তার মুক্তোর চাষের কারবারে। জাপানী মেয়েরাও ডুবুরির কাজ করে। কিভাবে এই মুক্তোর চাষ করা হয় তা এবার বলা যাক।

প্রথমে এগো উপসাগরে একজাতের ঝিনুক ছেড়ে দেওয়া হয় অগভীর জলে। এই অগভীর জলে এরা সমুদ্রের আগাছা, শিলা ইত্যাদির সঙ্গে নিজেদের আটকে রাখে। জুলাই-আগস্ট মাস নাগাদ ডুবুরিরা অগভীর জলে, যেখানে এদের ডিম পাড়ার আশা আছে, সে সব জায়গায় পাথরের টুকরো ফেলে দেয়। পরে ডিমগুলো আশ্রয় নেই এই পাথরগুলোর উপর। দু-তিন বছর পর শিশু ঝিনুকগুলো বড় হয়ে উঠলে তখন এদের তুলে এনে অভিজ্ঞ শ্রমিকেরা এদের শরীরের মধ্যে বালুকণা ঢুকিয়ে দিয়ে আবার রেখে আসে উপসাগরের গভীর জলে। তারপর প্রায় চার বছর পর এদের মধ্যে মুক্তোর জন্ম হয়। তবে সবকটির মধ্যেই যে মুক্তো জন্মায় তা নয়।

ডুবুরিরা গিয়ে আবার এই ঝিনুকগুলোকে সংগ্রহ করে আনে। এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চলে এই কাজ। সংগৃহীত একশোটি মুক্তোর মধ্যে মাত্র পাঁচ-ছ'টি মুক্তো বাজারে চড়া দামে বিক্রী করবার মতো আর বাকীগুলো সব নিম্নমানের। তবে একশোটি ঝিনুক থেকে ভালোমন্দ প্রায় চল্লিশ থেকে ষাটটি মুক্তো পাওয়া যায়।

১৯/আর, সেলিমপুর রোড, পোঃ—ঢাকুরিয়া, কলি-৩১

৯-এর মজা • শ্রীসজল চক্রবর্তী

অঙ্ক বলতে আমরা ১, ২, ৩,...এইগুলোকে বোঝাবো। আর সংখ্যা বলতে ১২, ১৩৪, ৫৬৭৮...এইগুলোকে বোঝাবো।...তা যাই হোক—

দুই অঙ্কের বড় সংখ্যা কী? বললেই চট করে উত্তর দেবে—৯৯। যদি বলি, তিন অঙ্কের বড় সংখ্যা? তাহ'লেও বলবে—৯৯৯। আসলে এই বড় ব্যাপারটাই ৯। আর ৯-এর মজাটাও কম নয়!—এই মজাটাকেই কাজে লাগিয়ে কীভাবে তাক্ লাগাবে সেটাই বলছি—

যে কোনো একজনকে বলো—একটা বিরাট সংখ্যা ভাবতে। সে-টা '৮' অঙ্কের, ৯ অঙ্কের, বা আরো যত বেশী অঙ্কের খুশী বলো।...যেহেতু সংখ্যাটা খুব বড় হ'তে পারে, তাই তাকে একটা আলাদা কাগজে সংখ্যাটাকে লিখে নিতে বলো। অবশ্যই সে তোমাকে ঐ সংখ্যাটা দেখাবে না।

এবার তাকে বলো ঐ সংখ্যাটাকে '৯' দিয়ে গুণ করতে। এবং গুণফলটা লিখে ফেলতে।...এখন গুণফলটার সব অঙ্কগুলোকে যোগ করতে বলো। আর জিজ্ঞেস করো যোগফলটা এক অঙ্কের হ'লো কি-না। যদি হয়তো কোনো কথাই নেই, আর যদি না হয় তবে নতুন সংখ্যাটার অঙ্কগুলোকে যোগ করতে বলো। এবং এইভাবে ঠিক ততক্ষণ পর্যন্তই যোগ করতে বলবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সংখ্যাটা এক অঙ্কে পরিণত হয়।...যেই এক অঙ্কে পরিণত হয়ে গেল, তখন-ই তোমার আসল কাজ শুরু।...সে কিন্তু এ-ব্যাপারে তোমাকে কিছুই বলবে না—অথচ তুমি পুরো ব্যাপারটাই জেনে বসে আছ। কেমন করে জেনে বসে আছ, সেটা পরে বলছি।

এক অঙ্কে পরিণত হবার পরের কাজটা কিন্তু তোমার নিজের ইচ্ছেমত।...এক-এক জনকে এক-এক রকমভাবে বলবে। যাতে না তোমার ব্যাপারটা কেউ ধরে ফেলে। যেমন—(এক অঙ্কে পরিণত হবার পর) কাউকে বললে, এবার ৬ যোগ করুন। ৭ দিয়ে ভাগ করুন। এবং ভাগফলটা তুমি টপ করে বলে দাও—২।...সে অবাক হবে বৈকি!

আবার, কাউকে হয়তো বললে—এবার '৮' যোগ করুন। ৫ দিয়ে ভাগ করুন। ভাগফল '৩' এবং অবশিষ্ট '২' টা চট করে বলে দিয়ে তাকে-ও তাক্ লাগিয়ে দাও।

এক-এক জনকে এক-এক রকম ভাবে বলবে। সব জায়গায় একরকম ভাবে বললে ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে। এবার কারণটা তলিয়ে দেখা যাক :—

৯ দিয়ে যে-কোনো সংখ্যাকেই গুণ করোনা কেন—গুণ করার পরে অঙ্কগুলোকে যোগ করলে সব সময়েই ৯ হবে। আর এই '৯' তুমি সহজে জেনে যাচ্ছ বলেই না পরের ব্যাপারটা নিজের ইচ্ছে মত করে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে। যেমন :—

১২৭৮৬৫
× ৯

এবার, এই নতুন সংখ্যাটার সব কয়টা অঙ্ক যোগ করো :— ১+১+৫+৭+৮+৫=২৭

আবার, নতুন সংখ্যার অঙ্ক দুটো যোগ করো—২+৭=৯

যে-ভাবেই যে সংখ্যা নিয়েই করা হোক্ না কেন—যোগফল সর্বদাই '৯' হবে। ছোটবেলার নামতার দিকে তাকাও তাহ'লে মজটা আরো পরিষ্কার হ'য়ে যাবে—

৯	৯	৯	৯	৯
১	২	৩	৪	৫
৯	১৮	২৭	৩৬	৪৫
৯	৯	৯	৯	৯
৬	৭	৮	৯	১০
	১+৮	২+৭	৩+৬	৪+৫
	=৯	=৯	=৯	=৯

[আর দেখাচ্ছিনা এগুলো উল্টোভাবে আসবে]

সুতরাং এক অঙ্কটা যে '৯' সেটা কেউ না জানালেও তুমি তো জেনেই বসে আছ। তার সাথে ৫ যোগ করলে নিঃসন্দেহে (৯+৫=) ১৪ হবেই। এবং এই ১৪ কে ৭ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল যে (১৪÷৭=) ২ হবেই তা'তে আর সন্দেহ কোথায়! বেশ মজা!

৩-কে, নস্কর পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১

জীবন বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ ২

ডঃ তারকমোহন দাস

গত সংখ্যায় বলা হয়েছিল বিজ্ঞানের মূল কাঠামোটি বিজ্ঞানের সকল শাখায় একই। কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করতে হলে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়,—তাকে বলা হয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই ধাপগুলি হ'ল পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন, কল্পিত ধারণা, পরীক্ষা, ফলাফল বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত। গত সংখ্যায় পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছিল। এই সংখ্যায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অবশিষ্ট ধাপগুলি সম্পর্কে কিছু কথা বলা হ'ল।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বিতীয় ধাপ হ'ল যা তোমার, আমার বিশেষ ভাবে চোখে পড়ছে সে সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করা। চোখের সামনে আমরা প্রতিদিন অনেক কিছুই দেখছি, কিন্তু খুব অল্পজনই সে সম্পর্কে আরও কিছু জানবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করে থাকে বা সে বিষয়ে নূতন কোনো প্রশ্ন করে। পর্যবেক্ষণ শক্তির মত প্রশ্ন করার মধ্যেও যথেষ্ট বিদ্যা-বুদ্ধির দরকার হয় এবং একটা প্রশ্নের সূত্র ধরে বিজ্ঞানের অনাবিষ্কৃত রাজ্যের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত প্রবেশ করা যায়। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ দেখছে গাছ থেকে পাকা ফল মাটিতে ঝরে পড়ে, কিন্তু সে সম্পর্কে একমাত্র নিউটনই প্রথম প্রশ্ন করেছিলেন 'ফল কেন মাটিতে পড়ল?' এবং এই প্রশ্নের সূত্র ধরে অগ্রসর হয়ে বিজ্ঞানের এক অতি বিরাট রাজ্য তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। ছেলেমেয়েরা অনেক সময় এমন অনেক প্রশ্ন করে যার জন্য বড়দের কাছ থেকে তাদের বকুনি খেতে হয়। বড় উদ্ভট মনে হয় প্রশ্নগুলি বড়দের কাছে, সঠিক উত্তর জানা না থাকার জন্য তাঁরা বড়ই বিব্রত বোধ করেন। কিন্তু *কোন প্রশ্নই উদ্ভট নয়, বরং প্রশ্ন যত উদ্ভট হয়, তার* মধ্যে নূতন চিন্তার খোরাক থাকে তত বেশী। অনেক সময় বড়রা নিজের মান বজায় রাখবার জন্য সম্পূর্ণ মিথ্যা, মনগড়া উত্তর দিয়ে ছেলেমেয়েদের শান্ত করবার চেষ্টা করেন, সেটা আরও খারাপ।

কিন্তু একটু সতর্ক ভাবে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এমনি অজস্র প্রশ্নের সম্পূর্ণ মিথ্যা ও মনগড়া উত্তর পেতেই অভ্যস্ত ছিল এবং তাই নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মের আগে পর্যন্ত মানুষের স্বর্গ, মর্ত, নরক, জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে অধিকাংশ ধারণাই ছিল উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত সম্পূর্ণ কাল্পনিক, তাতে সত্যের লেশ মাত্র ছিল না।

মানুষের মনে প্রশ্নের অন্ত নেই। মানুষের বিবর্তন যবে থেকে ঘটেছে সম্ভবতঃ তখন থেকেই মানুষ অজস্র প্রশ্ন করে চলেছে তার আশেপাশে সব কিছু বিষয় সম্পর্কে যেমন—সূর্য কেন আলো দেয়? বৃষ্টি কেন হয়? মৃত্যুর পর মানুষ কোথায় যায়?—ইত্যাদি। সেই সময়ে সমাজে যাঁরা নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাঁরা নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি ও প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী যা কল্পনা করেছিলেন, যা অনুমান করেছিলেন তাই সকলে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিল। এইভাবেই সূর্যদেব, বরুণদেব, স্বর্গ, নরক সম্পর্কে মানুষের ধারণার সৃষ্টি হয়। কিন্তু কেউ কোনদিন তার সত্যতা যাচাই-এর কোন উদ্যোগ বা হাতেকলমে পরীক্ষার আয়োজন করে নি। যেদিন থেকে মানুষের ঐ চেষ্টা শুরু হয়েছিল সেই দিন থেকেই মনে হয় আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছিল।

নানারকম প্রশ্ন থেকে একটি কাল্পনিক উত্তর খাড়া করা কিন্তু আদৌ অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার নয়, বরং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অতি প্রয়োজনীয় একটি ধাপ (তৃতীয় ধাপ) হিসাবে স্বীকৃত। বিজ্ঞানীরা নানা রকম প্রশ্ন থেকে প্রথমে একটি কল্পিত উত্তর ঠিক করেন, অথবা পরিবেশের কোন সমস্যা সমাধানের জন্য একটি কল্পিত উপায় ঠিক করেন, এখানেও বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত সতর্ক-ভাবে নানা দিক ভেবেচিন্তে, নানা পরীক্ষার ফলাফল দেখে তবে একটি 'উত্তর' বা 'উপায়' কল্পনা করেন। তারপর উপযুক্ত পরীক্ষার সাহায্যে তার সত্যতা যাচাই করে দেখেন। এই উপযুক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ সংগ্রহ করা হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চতুর্থ ধাপ এবং সবচেয়ে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

সাধারণ মানুষ অনেক কিছু দেখে, অনেক বিষয়ে কৌতূহলও প্রকাশ করে, নানা রকম প্রশ্নও তোলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 'শোনা কথা' বা প্রচলিত ধারণার ওপর নির্ভর করে একটি মনগড়া উত্তর খুঁজে নেয়, এবং তাই নিয়েই

সন্তুষ্ট থাকে। এই মনগড়া উত্তর কতটা সত্য, কতটা মিথ্যা তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, পরীক্ষা করে দেখা তো দূরের কথা। এখানেই বিজ্ঞানীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের তফাৎ, এখানেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ। বিনা পরীক্ষায়, বিনা প্রমাণে, বিনা যুক্তিতে বিজ্ঞানে কোন কিছুই গৃহীত হয় না। প্রাচীন গ্রন্থে কোন কিছু লেখা আছে বলেই তা গ্রহণ করতে হবে, অথবা তথাকথিত কোন বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ বলছে বলেই তা সত্য হিসাবে নিতে হবে বিজ্ঞানে এমন কথা কখনও বলে না। বিজ্ঞানে প্রতিটি কল্পিত ধারণা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখা হয়। এই পরীক্ষার সময় পরিসংখ্যান তত্ত্বের (Statistics) সাহায্য নিয়ে পরীক্ষার একটি নকশা বা ডিজাইন তৈরী করা হয়, পরীক্ষাটি যে উদ্ভিদ বা প্রাণীর ওপর করা হচ্ছে তাদের যথেষ্ট সংখ্যায় নেওয়া হয়, এবং পরীক্ষার ফলাফল একজন বিজ্ঞানী নয়, একাধিক বিজ্ঞানীর দ্বারা স্বীকৃত হলেই তবে তা সাধারণতঃ গৃহীত হয়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পঞ্চম ধাপ হল পরীক্ষার ফলাফল যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করা এবং সবশেষে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এখানেও পরিসংখ্যান তত্ত্বের সাহায্য নেওয়া হয় এবং পূর্ববর্তী অন্যান্য গবেষণার ফল মিলিয়ে দেখে নূতন কি তথ্য জানা গেল তা খুঁটিয়ে দেখা হয়। বিজ্ঞান চর্চার এই পঞ্চম বা শেষ ধাপটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কেননা পরীক্ষার ফলাফল চোখের সামনে খোলা থাকলেও বিজ্ঞানীরা অনেক সময় তার সঠিক তাৎপর্য বা তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব বুঝতে পারেন না এবং সম্পূর্ণ ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিগত ৫০০ বছরের মধ্যে এরকম দুর্ঘটনা বহুবার ঘটেছে।

এখানে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে এই অধ্যায় শেষ করব। বংশগতি ও প্রজননবিজ্ঞানের জনক গ্রেগর মেন্‌ডেল তাঁর যুগান্তকারী পরীক্ষার ফলাফল ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশ করেন। তখন সেই সময়কার কোন বিজ্ঞানীই তার সঠিক অর্থ বা তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি। পরিষ্কার ভাষায় তাঁর গবেষণার ফলাফল লেখা থাকলেও কেউই তার প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারেন নি। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে সম্পূর্ণ অখ্যাত, অজ্ঞাত অবস্থায় মেন্‌ডেলের মৃত্যু হয়। তাঁর গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হবার চোত্রিশ বছর পর ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক ডি-ভ্রিস মেনডেলের পরীক্ষার ফলাফলগুলি পুনরুদ্ধার করেন এবং তার গুরুত্ব জনসমাজে তুলে ধরেন।

পৃথিবীর অনেক মহৎ আবিষ্কারের পেছনেই আছে এই রকম দুঃখজনক ঘটনার ইতিবৃত্ত, সময়োচিত সম্বর্ধনা বা উপযুক্ত স্বীকৃতি তাঁদের ভাগ্যে বিশেষ জোটে নি। অনেক সময় অবার বিনা প্রস্তুতিতেই কোন আকস্মিক ঘটনার ফলে বড় রকমের আবিষ্কার ঘটেছে, দেশের মানুষ সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে উপকৃত হয়েছে। ভারতের নিজস্ব চা-গাছের আবিষ্কারের পেছনে এই রকম দুটি ঘটনা জড়িত আছে। বহু পূর্বে চীন দেশ থেকে আমদানী করা চা সারা পৃথিবীতে ব্যবহৃত হত। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী চীন দেশ থেকে চা-গাছের বীজ আনিয়ে ভারতে যে চা-এর চাষের চেষ্টা করেছিল তা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৮১৯-১৮২০ খ্রীস্টাব্দে আসামের প্রথম কমিশনার ডেভিড স্কট্ আসামের জঙ্গলের মধ্যে ভারতের নিজস্ব চা-গাছ প্রথম আবিষ্কার করেন এবং ঐ দেশীয় চা-গাছের কিছু নমুনা সযত্নে কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নাথানিয়েল ওয়ালিচের কাছে পাঠান। নাথানিয়েল ওয়ালিচ ছিলেন সে যুগের একজন দিক্‌পাল উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্। তিনি অবিশ্বাস্য ঔদাসীন্যের সঙ্গে স্কট সাহেবের পাঠান এই নমুনাটি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বহু পরে ফুলের আকৃতি ও অন্যান্য নিদর্শন দেখে স্বীকার করেন এটি চা-গাছই বটে এবং বিনা পরীক্ষায় আর একটি মন্তব্য জুড়ে দিলেন—পানীয় হিসাবে এর পাতা ব্যবহার করা যাবে না, এটি জংলি চা-গাছ। সাধারণ মানুষের হাজারটা ভুলে যত না ক্ষতি হয় পাণ্ডিতের একটি ভুলে তার থেকে বেশী ক্ষতি হয়। নাথানিয়েল ওয়ালিচের ঐ ভুল সিদ্ধান্তের ফলে ভারতে দেশীয় চা-গাছের চাষ অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই চাষ শুরু হবার কাহিনীটিও কম মজার নয়। ভারতে চীনদেশীয় চা-গাছের চাষ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ায় ১৮৪০ সালে ইংরাজ সরকার এই সব বাগান এক বেসরকারী কোম্পানীকে বেচে দিতে বাধ্য হন। এই বেসরকারী কোম্পানীও প্রথমে প্রচণ্ড লোকসানের সম্মুখীন হয়েছিলেন। চীন দেশের গাছে পাতা এত কম হত যে তাতে লাভের আশা কিছুই ছিল না। শেষে তাঁরা মরিয়া হয়ে চাষের সঙ্গে ভেজাল হিসাবে চালাবার কুমতলব নিয়ে কিছু কিছু আসামের দেশীয় চা-গাছ পুঁততে আরম্ভ করেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই তাঁরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন এই সব গাছের পাতার স্বাদ চীন দেশের পাতা থেকে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়, বরং সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ, এবং ভারতের জলবায়ুর পক্ষে এটিই আদর্শ চা-গাছ। এইভাবে

সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে ভারতীয় চা-গাছের গুণাগুণ আবিষ্কৃত ও তার চাষ শুরু হয়েছিল।

অনেক আবিষ্কার যেমন বিনাপ্রস্তুতিতে সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে ঘটেছে যার ফলে, আমরা লাভবান হয়েছি, তেমনি অনেক সময় গবেষণার ফলাফল যথেষ্ট পরীক্ষা না করে, বিশেষ করে সুদূরপ্রসারী ফলাফল সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ না করে শুধুমাত্র আপাত লাভের কথা বিবেচনা করে ব্যবহারের ফলে সমাজ অশেষ-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কয়েক দশক আগে ইউরোপে থালিডোমাইড্ নামে একটি নব-আবিষ্কৃত ভেষজ স্নায়বিক উত্তেজনা হ্রাস ও ঘুমের ঔষধ হিসাবে বাজারে ছাড়া হয়েছিল. প্রসূতির শরীরে এই ঔষধটির ক্রিয়া সম্পর্কে কোন তথ্যই সংগ্রহ করা হয় নি। কিছুদিন পরে দেখা গেল যে-সব প্রসূতি ঐ ঔষধটি ব্যবহার করেছিল তারা প্রত্যেকেই বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দিচ্ছে, কারো হাত নেই, কারো পা নেই,—সমাজে এক ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হল। ঔষধটি সঙ্গে সঙ্গে তুলে নেওয়া হল, কিন্তু সমাজের যা ক্ষতি হল তা অপূরণীয়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতিটি ধাপই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এই শেষ ধাপটি,—পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সামান্য ভুল, সামান্য অবহেলা অশেষ ক্ষতির কারণ হতে পারে, কিংবা তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি, কোন আকস্মিক ঘটনা একটি বিরাট আবিষ্কারে সাহায্য করে থাকে। তাই যারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়শোনা করছে, বিজ্ঞান চর্চা করছে তাদের প্রথম থেকেই এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতিটি ধাপ সম্পর্কে সঠিক অনুশীলনের সাহায্যে অনন্যসাধারণ দক্ষতার অধিকারী হওয়া দরকার। আমাদের দেশে যে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান চর্চা করছে সেই তুলনায় আবিষ্কারের সংখ্যা এত নগণ্য কেন?—আমার মনে হয় এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ওপর গোড়া থেকে যথাযথ গুরুত্ব না দেয়ার ফলেই এটা ঘটছে।

২৪/এ, সার্কুলার গার্ডেনরিচ রোড, কলিকাতা-৭০০০২৩

আগামী সংখ্যা থেকে পদার্থবিদ্যার উপরে ধারাবাহিক লেখা শুরু করবেন

ডঃ অলক চক্রবর্তী

খুদে বৈজ্ঞানিক ঃ দিলীপ দাস

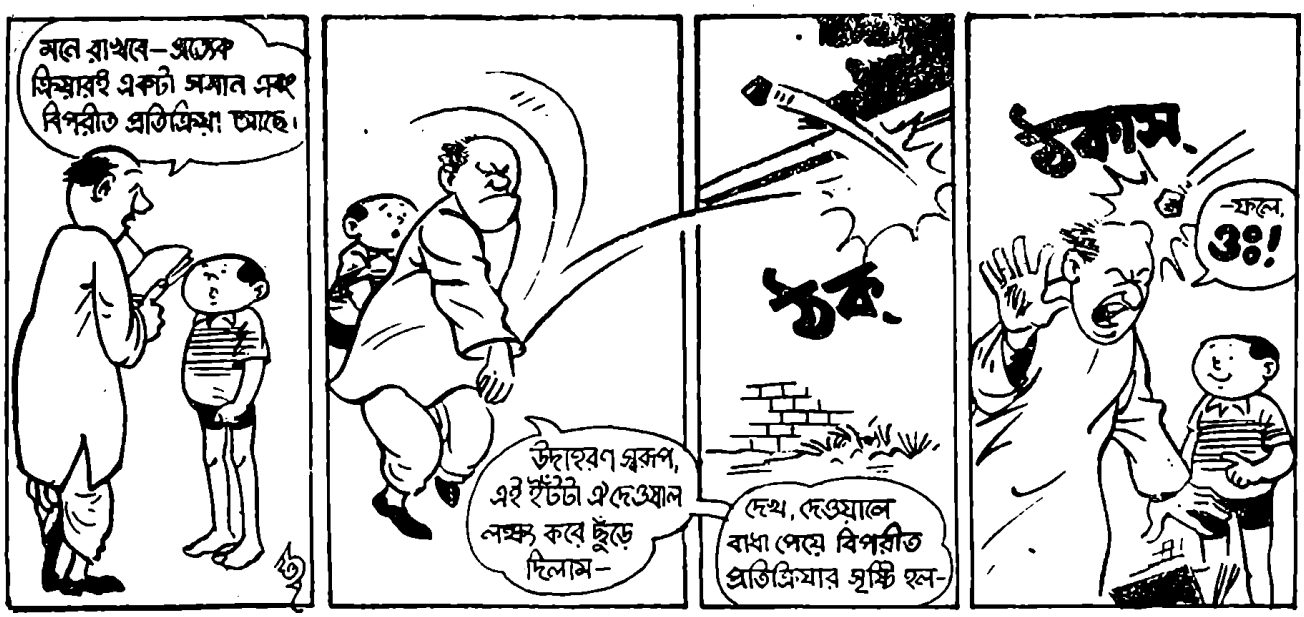

বিজ্ঞানের যুদ্ধ

নারায়ণচন্দ্র চন্দ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ঘটনা। যন্ত্রসজ্জিত জার্মান বাহিনী ইউরোপের প্রায় সমগ্র ভূখণ্ড অধিকার করেছে। শৌর্যের সঙ্গে বিজ্ঞান যুক্ত হলে কী প্রচণ্ড শক্তির সমাবেশ হয় হিটলারের জার্মানি তার প্রমাণ। নৌশক্তিতে ইংলণ্ড তখনও শ্রেষ্ঠ। তাই হিটলারের নির্দেশ —ইংরেজদের জাহাজ সাগরের ওপর যেন না ভাসে, জলের তলায় সমাধি দাও। বিজ্ঞানীরা বের করলেন গোপন অস্ত্র। জাহাজ চলেছে, কোথাও শত্রুপক্ষের দেখা নেই হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে বিশাল লোহার জাহাজ টুকরা টুকরা হয়ে গেল। মাটির কলসী লক্ষ্য করে মার্বেল গুলতি ছুঁড়লে যে অবস্থা ঘটে, সেই রকম। ইংরেজের জাহাজ ডুবতে লাগল। হিটলারের উল্লাস। অদৃশ্য গোপন অস্ত্রটা কী ধরনের ইংরেজ বিজ্ঞানীরা আঁচ করতে পারেন না। দূর-সমুদ্রে তো ডুবছেই, টেমস্ নদীর মুখেও এইভাবে জাহাজ ডুবে গেল একদিনে ছয়খানা।

বুদ্ধির ওপর টেক্কা

একদিনের এক ঘটনা থেকে গোপন অস্ত্রকে অকেজো করার সূত্র মিলল। রাত্রি সাড়ে ন'টা নাগাদ একখানা জার্মান উড়োজাহাজ ইংলণ্ডের উপকূলে প্যারাসুট দিয়ে একটি ভারী জিনিস জলের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। পাইলট ভেবেছে কেউ তাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু দেখেছিল উপকূলরক্ষী দুইজন সৈনিক। বস্তুটা কি বোঝা গেল না। গোপনে তল্লাসী শুরু হল। সে জায়গায় ভাটার সময় কাদা জেগে ওঠে। তার অদূরে ৫০০ ফুট জলের নীচে রয়েছে একটি পিপার মত জিনিস। তার গায়ে শিকড়ের মত কয়েকটা খাড়া গোঁজ। গভীর রাতে নিকষকালো অন্ধকারে শুধু ক্ষীণ জলটর্চের সাহায্যে চারজন বিজ্ঞানী এই মারাত্মক জিনিসটি উদ্ধার করতে জলে ডুব দিয়ে ৫০০ ফুট নীচে গিয়ে পৌঁছলেন। দেখেন, আরো একটি ঐ রকম জিনিস রয়েছে কাছেই। বুঝলেন বিস্ফোরক ভরতি বোমা। যে কোন মুহূর্তে তাঁদের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু দেশের নিরাপত্তার জন্য নিজের জীবন দিতে তাঁরা পিছ্‌পা নন। বস্তুটি সন্তর্পণে তুলে আনা হল, পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হল গবেষণাগারে। বোঝা গেল ওগুলি 'চুম্বক মাইন'। সাগরতলে কোথাও রেখে দেওয়া হয় অথবা কিছুটা জলের তলা দিয়ে ভেসে ভেসে চলে। লোহার জাহাজ এর চুম্বক আওতার মধ্যে এলে ছুটে গিয়ে জাহাজের তলায় আঘাত করতেই বিস্ফোরণে জাহাজ চৌচির হয়ে যায়। এরূপ একটা ভাসমান মাইনের গায়ে জার্মানরা কৌতুক করে মাইনের মনের কথাটি লিখে দিয়েছিল: আমার যাত্রা যদি শুভ হয়, চার্চিলের কপালে জুটবে প্রচণ্ড ধাক্কা!

চার্চিল তখন নৌবহরের মন্ত্রী। বিজ্ঞানীরা চার্চিলকে এবং সেই সঙ্গে সমগ্র বৃটেনকে ধাক্কা থেকে রক্ষা করলেন। চুম্বক মাইন পরীক্ষা করে তাঁরা এর চৌম্বক শক্তি নষ্ট করে দেওয়ার কৌশল আবিষ্কার করেন। বৈদ্যুতিক তার জাহাজের গায়ে লাগিয়ে ডি-গজিং ব্যবস্থা করা হল, ফলে চুম্বক মাইন কাছে থাকলেও জাহাজের দিকে সে আর আকৃষ্ট হল না। এ ব্যবস্থা গোপন রাখা হল। জার্মান বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন না তাঁদের কৌশলের ওপর টেক্কা দিয়ে মারণাস্ত্র ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

অদৃশ্য সন্ধানী-আলো

হিটলারের অভিপ্রায় ছিল চুম্বকমাইন দিয়ে বৃটিশ নৌবহর লোপাট করা আর বোমাবর্ষণ করে শহরগুলি 'মুছে ফেলা'। চুম্বকমাইন অল্পদিন ধ্বংসকার্য চালিয়েই নীরব হয়ে গেল। তখন বোমার দাপট চলতে লাগল বৃটেনের শহর-বন্দরের ওপর। কুড়ি হাজার ফুট উঁচু দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বোমারু বিমান আসে; দিনের আলো, চাঁদনি রাতের আবছা আলো আর অন্ধকার রাতের নিকষকালো পর্দা কোন কিছুই বাধা নয়। রাত্রিতে সামান্য জোনাকির আলোর মত ক্ষীণ আলোক কণাও যখন থাকে না তখনও নির্দিষ্ট শহরে নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর ওপর বোমা ফেলে বোমারু বিমান নিরাপদে ফিরে যায়। কেমন করে? বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের মনে এই প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়।

চার্চিল এই প্রশ্ন রাখলেন বিজ্ঞানের অধ্যাপক বন্ধু লিনডেম্যান-এর কাছে। অধ্যাপক বলেন—বিজ্ঞানের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। মনে হচ্ছে, জার্মান বিজ্ঞানীরা অদৃশ্য আলোক-রশ্মি দিয়ে বোমারু বিমানগুলো পরিচালনা করছেন।

—এর প্রতিকার?

—হ্যাঁ, প্রতিকার সম্ভব। আমার অক্সফোর্ডের ছাত্র ডঃ জোন্‌সকে আপনার কাছে পাঠাবো। উনি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।

নির্দেশ পেয়ে ক্যাবিনেট মিটিং-এর গোপনকক্ষে ডঃ

জোন্‌স উপস্থিত হলেন। পদার্থবিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র তরুণবয়স্ক জোন্‌স। চোখে তাঁর বিস্ময়, ভূগর্ভে বোমা-নিরোধক কক্ষ, দেশের সর্বোচ্চ নায়ক কয়েকজন উপস্থিত। দেশের সামনে গুরুতর জীবনমরণ সমস্যা। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে জোন্‌স বললেন—মনে হয় চালকের সামনে ডানে-বাঁয়ে দুটি আলোক-রেখা তাকে সঠিক পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। চালকের কাজ শুধু আলোক রেখার ওপর নজর রেখে চালিয়ে যাওয়া ; যেখানে অন্য একটি আলোক রেখা আড়াআড়ি ফুটে ওঠে—দ্রাঘিমারেখার ওপর অক্ষরেখার মত—সেখানেই বোতাম টিপে বোমা ফেলে ফিরে যাওয়া। ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে আলোক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে এই অদৃশ্য আলোর সংকেত দেওয়া হয় বলে আমার ধারণা।

চার্চিল যখন ডঃ জোন্‌সের ভূতুড়ে কারণ বিশ্লেষণ শুনছিলেন তাঁর মনে পড়ল বাল্যে-পড়া এক ভূতুড়ে কবিতা ঃ

এক যে ছিল মিঃ জোন্‌স
সে এসে বলতে লাগল এক কাহিনী—
পনর বছর আগে সে শুনেছিল এক গোঙানি ;
পাহাড়ে গিয়েছিল পাথর আনতে,
তখন পায় সে গোঙানি শুনতে।
গোঙানির পিছু নিয়ে চলতে চলতে
পৌঁছিল এক মাঠেতে।
দেখে বিরাট এক দাঁড়কাক বসে
ড্রামবাজানো ছেলেটির হাড় ঠোকরাচ্ছে কষে।

ডঃ জোন্‌সের কথা কারো কারো কাছে অবিশ্বাস্য মনে হল। কিন্তু চার্চিল কথাটি উড়িয়ে দিলেন না। জিজ্ঞেস করলেন—এর প্রতিকার সম্ভব ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কিভাবে ?

—বিমান চালকের নির্দেশক আলোটিকে বেঁকিয়ে দিয়ে।

চার্চিল বললেন—আজ থেকেই কাজ শুরু করো। অর্থ, সরঞ্জাম যা প্রয়োজন সব পাবে।

তরুণ বিজ্ঞানী কিভাবে এই মরণ-আলো অন্য পথে ঘুরিয়ে দেবার যন্ত্র তৈরী করে কোথায় বসালেন তা অন্যের অগোচর থাকল।

কয়েকদিন পরের কথা। এক অফিসার ভদ্রলোক লণ্ডন থেকে তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের পল্লীগ্রামের বাড়িতে রাখতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে চার্চিলকে বললেন—এক তাজ্জব ব্যাপার! গতকাল সারারাত ধরে আমাদের বাড়ি থেকে খানিক দূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে জার্মানরা মনে হল বোমা ঢেলে দিয়ে গেল। একশোর বেশি তো গুণলামই। এমন তো আগে হয়নি!

চার্চিল বুঝলেন ডঃ জোন্‌সের অদৃশ্য আলো বেঁকিয়ে বোমারু বিমান অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার কৌশল কার্যকরী হয়েছে। তাঁর সহকর্মী অন্য যে ভদ্রলোক এই গোপন বিষয় জানতেন তাঁর চোখের দিকে চেয়ে দুজনে 'আকর্ণ-বিস্তৃত বিমল আনন্দের হাসি বিনিময় করলেন'। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টিকে গোপন রাখা হয়েছিল।

চার্চিল তাঁর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে সফল গর্বের সঙ্গে বলেছেন ঃ 'বৃটিশ বিজ্ঞান যদি জার্মানির চেয়ে উন্নততর না হত এবং উন্নত কৌশল যদি আত্মরক্ষার কাজে লাগানো না যেত তবে আমাদের পরাজয় এবং সেই সঙ্গে ধ্বংস ছিল অবধারিত।'

পশুপক্ষীর জগতে বাহুবলই যুদ্ধে জয়ী হওয়ার একমাত্র সম্বল। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানুষ প্রমাণ করেছে বিজ্ঞান বলবত্তর।

'লেখনী', ঋষি বঙ্কিম চ্যাটার্জী রোড, বারাসাত, ২৪ পরগনা

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যার 'অ্যামেচার রেডিও রোমাঞ্চ' প্রবন্ধে কয়েকটি ছাপার ভুল আছে, তোমরা এগুলো শুধরে নিও।

পৃঃ ৩৭—১ম সারি—আছে 'পল গড়লে', পড়তে হবে 'পল গড্‌লে'। পৃঃ ৩৮—২য় সারি—আছে 'ভারতবর্ষ (VU_2).' পড়তে হবে 'ভারতবর্ষ (VU2)'। পৃঃ ৩৯—১ম সারি—আছে Morse Code-এ 'ডট্‌' (...)', পড়তে হবে 'Morse Code-এ 'ডট্‌' (.)'

পৃঃ ৩৯—২য় সারি = আছে y —. .—হবে y —. —— আছে , .—.—.— হবে , ——. .——

পৃঃ ৪০ = ১ম সারি আছে $\overline{AA}$—AU after $\overline{AB}$ — before হবে $\overline{AA}$—All after $\overline{AB}$—All before

পৃঃ ৪০—২য় সারি আছে P—PARA হবে P—PAPA আছে Q—QUEBEL হবে Q—QUEBEC আছে Y—YANKEC হবে Y—YANKEE

একটি দ্বীপের জন্ম

বিমান বসু

প্রায় বিশ বছর আগের ঘটনা। সুদূর উত্তরের দেশ আইস্‌ল্যাণ্ড। আইস্‌ল্যাণ্ড আসলে একটি বিশাল দ্বীপ। তার দক্ষিণ উপকূলের কাছাকাছিও আছে কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপ। এই রকম একটি দ্বীপের কাছেই সেদিন মাছ ধরছিল ছোট এক মাছ-ধরা নৌকো। তারিখটা ছিল ১৪ই নভেম্বর ১৯৬৩। তখনও ঠিক ভোর হয়নি। হঠাৎ নৌকোটা প্রবল ভাবে দুলে উঠলো। পর মুহূর্তেই ভোরের আবছা আলোয় দেখা গেল দক্ষিণে অদূরে সমুদ্রের বুক থেকে উঠছে ঘন কালো ধোঁয়া। মাছ-ধরা সেই নৌকোটির ক্যাপ্টেন প্রথমে ভাবলেন হয়তো কোনও জাহাজে আগুন লেগেছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর ভুল ভেঙে গেল। বাইনোকুলার চোখে দিয়ে তিনি দেখলেন যে কোনও জাহাজের চিহ্ন-মাত্র নেই। ধোঁয়াটা উঠছে সোজা জলের মধ্যে থেকেই আর প্রতি মুহূর্তে তা যেন আরও তীব্র হয়ে উঠছে। সঙ্গে বেরোচ্ছে প্রচুর ছাই আর জলীয় বাষ্প। বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে পোড়া গন্ধকের ঝাঁঝালো গন্ধ। সেদিন তাঁরা বুঝতে না পারলেও, সেই মাছ-ধরা নৌকোর যাত্রীরা যা দেখলেন তা খুব কম লোকের ভাগ্যেই জোটে। তাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন একটি দ্বীপের জন্ম। দ্বীপের নাম সার্টসি।

ঠিক এই মুহূর্তে তোমাদের অনেকে হয়তো আমাদের বঙ্গোপসাগরের নতুন দ্বীপ পূর্বাশার কথা ভাবছো। আসলে কিন্তু পূর্বাশা একেবারে নতুন কোনও দ্বীপ নয়। ওটা কেবল একটা চড়া যা গঙ্গার মোহানায় পলিমাটি জমে তৈরী হয়েছে। অনেক কাল আগে থেকেই ওটা আছে, তবে কখনো জলের ওপরে কখনো তলায়। এক্ষেত্রে পূর্বাশার 'জন্ম' বলে কিছু নেই।

কিন্তু সার্টসির বেলায় তা নয়। সমুদ্রের ওপর যেখানে সেদিন দ্বীপটি মাথা ফুঁড়ে বেরোল সেখানে তার আগে কিছুই ছিল না। অথচ দেখতে দেখতে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সেটা প্রায় তিন বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে মাঝারি আকারের দ্বীপে পরিণত হলো। আর সার্টসিই হলো পৃথিবীর একমাত্র দ্বীপ সমুদ্রগর্ভ থেকে যার জন্ম মানুষের চোখের সামনেই হলো। ভূবিজ্ঞানীদের কাছে এটা ছিল এক অমূল্য ঘটনা। কেন তা পরে বলছি।

পৃথিবীতে যত দ্বীপ আছে তাদেরকে প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়। এক, মহাদেশীয় দ্বীপ যেগুলি সাধারণ মহাদেশীয় ভূখণ্ডেরই অংশ, যেমন আমাদের আন্দামান, নিকোবর বা শ্রীলঙ্কা, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি। এ ধরনের দ্বীপ সাধারণতঃ মহাদেশীয় ভূখণ্ডের খুব কাছেই থাকে আর এদের মধ্যবর্তী সমুদ্র হয় অগভীর। দ্বিতীয় রকমের দ্বীপ হলো আগ্নেয়গিরিজাত। এদের উৎপত্তি হয় সমুদ্রতলের আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ফলে, যেমন সার্টসির বেলায় হলো। এ ধরনের দ্বীপ সাধারণতঃ থাকে মহাদেশীয় ভূখণ্ড থেকে বহু দূরে মহাসমুদ্রের মাঝখানে। এগুলির আর একটা বিশেষত্ব হলো এই যে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় সমুদ্রতলে যে সব পর্বতমালা আছে সেগুলির আশেপাশেই এ ধরনের দ্বীপ বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

মহাদেশীয় দ্বীপগুলির তুলনায় আগ্নেয়গিরিজাত দ্বীপ-গুলির সব কিছুই যেন একটু ভিন্ন, আলাদা। এদের মাটি, গাছপালা, জীবজন্তু সবেই যেন কিছু বিশেষত্ব আছে। আজ থেকে প্রায় দেড়শ' বছর আগে বিখ্যাত বিজ্ঞানী চার্লস্‌ ডারউইন সর্বপ্রথম এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করেন। এটা ছিল তাঁর থিওরী অফ ইভল্যুশন-এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তিনি দেখলেন যে মহাদেশীয় ভূখণ্ড থেকে দূরে থাকার দরুন এ ধরনের দ্বীপগুলির প্রত্যেকটি (বিশেষ করে যেগুলিতে মানুষ তখনও পৌঁছয় নি) যেন এক একটি পৃথক জগৎ, যেখানে প্রাণী ও উদ্ভিদের বিকাশ একেবারে স্বতন্ত্র। তাদের সঙ্গে মহাদেশীয় প্রাণী জগতের বিকাশের যেন কোনও সম্বন্ধই নেই। ডারউইনের এইসব পর্যবেক্ষণের পর বিজ্ঞানীরা এসব দ্বীপে জীবের উৎপত্তি ও বিকাশের সম্বন্ধে নানা রকমের মতবাদ প্রচার করেছেন। কিন্তু সে সব মতবাদের সত্যতা হাতে-নাতে প্রমাণ করবার সুযোগ তাঁরা কখনওই পাননি, অন্ততঃ সার্টসির আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত। সুতরাং এখন তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো সার্টসির জন্ম কেন বিজ্ঞানীদের কাছে এত মূল্যবান।

সমুদ্রতল থেকে শুরু করে যে কোনও একটি মহাসামুদ্রিক দ্বীপের গঠন প্রক্রিয়া খুবই সরল। আগেই বলেছি যে, এসব দ্বীপ কেবল মাত্র সে সব জায়গায় থাকে যেখানে সমুদ্রের তলায় কোনও পর্বতমালা আছে। এই সব জলের নিচের পাহাড় আসলে কিন্তু ভূপৃষ্ঠের মাঝ

বরাবর বিশাল বিশাল ফাটল যেগুলির মধ্যে দিয়ে অনবরত ভূগর্ভ থেকে গরম লাভা বেরিয়ে আসছে। সেই গরম লাভা সমুদ্রের জলের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে জমে পাথরের মত হয়ে নতুন ত্বক সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু কখনও কখনও ফাটলের কোনও এক অংশে অত্যধিক চাপ সৃষ্টি হলে গরম লাভা একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বেরিয়ে আসে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই সে জায়গায় একটা ঢিপি মতন হয়ে যায়। কয়েকদিনের মধ্যেই সেই ঢিপি কয়েক শো মিটার উঁচু হয়ে জলের স্তর ফুঁড়ে আত্মপ্রকাশ করে।

সার্টসির বেলায় ধোঁয়া ও ছাই প্রথম দেখা গিয়েছিল ১৪ই নভেম্বর। দুদিনের মধ্যেই নবজাত দ্বীপটির উচ্চতা হয়ে দাঁড়ালো প্রায় ৪০ মিটার। লম্বায় তখন প্রায় ৬০০ মিটার। কিন্তু তখনও লাভা প্রবাহ শুরু হয় নি। কেবলমাত্র ঝামাপাথর আর ছাইএর পাহাড় তৈরী হচ্ছে। অথচ ঝামাপাথরের পাহাড় কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কারণ সমুদ্রের ঢেউ-এর ধাক্কায় তা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায়।

এরপর প্রায় চার মাস, মানে ১৯৬৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এরকম ছাই বর্ষণ চললো। দ্বীপ আয়তনে বাড়ছে ঠিকই কিন্তু লাভার পাত্তা নেই। আর লাভা না বেরোলে তো সার্টসি কিছুদিনের মধ্যে ধুয়ে মুছে যাবে। ভূবিজ্ঞানীরা চিন্তায় পড়লেন। সকলেরই এক ভাবনা : এরকম একটা সুযোগ কি বিফলে যাবে?

তারপর এলো এপ্রিল। সেই সঙ্গে শুরু হলো লাভার বন্যা। বিজ্ঞানীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। গলা লাভার আস্তরণ ধীরে ধীরে সমস্ত দ্বীপটাকে ঢেকে দিল। জমা লাভা পাথরের মত শক্ত। সমুদ্রের ঢেউ তার আর কিছু করতে পারবে না। সার্টসি অমর হয়ে গেল। সেই সঙ্গে পৃথিবীর মানচিত্রে যুক্ত হল আরও একটি দ্বীপের নাম।

সার্টসি অমর হলো বটে কিন্তু সে তখনও বন্ধ্যা। তার মাটিতে তখনও কিছুই গজায় না। তারপর মাত্র একটা বছর। একদল বৈজ্ঞানিক গিয়ে দেখলেন সার্টসির বন্ধ্যাত্ব কেটে গেছে। নতুন দ্বীপের মাটিতে অঙ্কুরিত হয়েছে প্রথম চারা। আরও চার বছর পর ১৯৬৮ সালে সার্টসিতে পাওয়া গেল নানারকমের উদ্ভিদ, ২২ রকমের পোকামাকড় আর ২৩ রকমের পাখি। তাদের কেউ বা বাতাসে উড়ে এসেছে কেউবা এসেছে, জলে ভেসে। সে আসা আজও চলছে ও চলবে। আজ থেকে অনেক অনেক বছর পরে হয়ত সার্টসিকে দেখে কেউ চিনতেই পারবে না যে সে এই সেদিনও শিশু ছিল।

৭— ইউ এফ; কলেজ রোড
নিউ দিল্লী—১১০০০১

বিচিত্র ব্যবসা

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী

এক বিচিত্র ব্যবসায়ী এক টাকা কিলোগ্রাম দরে নুন কিনে এক টাকা কিলোগ্রাম দরেই বিক্রি করেন। এতে প্রতি কিলোগ্রাম নুন বিক্রি করে তাঁর প্রায় ৯ টাকা ১৫ পয়সা লাভ হয়। তাঁর এই বিচিত্র ব্যবসার রহস্যটা কী?

না, তোমরা যা ভাবছ তা কিন্তু নয়। আমি ঐ বিচিত্র ব্যবসায়ীকে চিনি। উনি অত্যন্ত সৎ। নুনে কেন, কিছুতেই ভেজাল মেশান না। নিখুঁত স্প্রিং ব্যালেন্সে ওজন করে মাল বিক্রি করেন। দাঁড়ি-পাল্লার বাটখারায় অনেক খদ্দেরের সন্দেহ থাকে বলে দাঁড়ি-পাল্লার পাটই উনি চুকিয়ে দিয়েছেন। কাজেই খুব বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তোমাদের অঙ্কটা কষতে হবে।

ও! ভাল কথা। ৯ টাকা ১৫ পয়সার আগে 'প্রায়' লিখলাম কেন জান? আসলে প্রতি ২৬ কিলো নুন বেচে ঐ ব্যবসায়ী লাভ করেন ২৩৮ টাকা। তাহলে প্রতি কিলোতে লাভ হয় ২৩৮÷২৬ টাকা=৯ টাকা ১৫ পয়সার সামান্য বেশি।

আর একটা কথা। এই অঙ্ক সমাধান করার সময় খেয়াল রেখ, আমরা এমন এক যুগে চলে গেছি যখন সৌরজগতের সব গ্রহেই মানুষ বাস করছে। ফেরি রকেট মানুষ আর মালপত্র নিয়ে নামমাত্র সময়ে চলে যাচ্ছে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে। ভাড়াও নামমাত্র। টাকা আর জিনিসপত্রের দাম মোটামুটি একই আছে ধরে নাও। নইলে আরও দুশ' ঝামেলা এসে যাবে।

কী? হয়ে গেছে? আমি জানতাম তোমরা পারবে। তবুও আমি চুপি চুপি অঙ্কটা কষে দিচ্ছি।

আসল রহস্যটা হ'ল—ভদ্রলোক বুধে নুন কিনে বৃহস্পতিতে বেচবেন। না, না। আমি বুধবার বা বৃহস্পতিবারের কথা বলছি না। আমি বলছি, ভদ্রলোক বুধ গ্রহে নুন কিনে বৃহস্পতি গ্রহে বিক্রি করেন। তোমরা তো জানই যে পৃথিবীতে যে নুনের ওজন ১০০ কিলোগ্রাম, বুধে সেই নুনের ওজন ২৬ কিলোগ্রাম, বৃহস্পতিতে ২৬৪ কিলোগ্রাম, শুক্রে ৯০ কিলোগ্রাম, শনিতে ১১৩ কিলোগ্রাম, মঙ্গলে ৩৭ কিলোগ্রাম, ইউরেনাসে ৮৪ কিলোগ্রাম আর নেপচুনে ১১৪ কিলোগ্রাম। প্লুটোয় কত গ্রাম? এর উত্তর এখনও অজানা। তবে হ্যাঁ, স্প্রিং ব্যালেন্সে মাপলেই শুধু ওজনের এই তারতম্য ধরা পড়বে। দাঁড়ি-পাল্লায় নয়।

কেন এমন হয়? তাও তোমাদের অজানা নয়। পৃথিবীর অভিকর্ষের তুলনায় অন্য সব গ্রহের অভিকর্ষ হ'ল এই রকম—বুধের ·২৬ গুণ, বৃহস্পতির ২·৬৪ গুণ, শুক্রের ·৯০ গুণ, শনির ১·১৩ গুণ, মঙ্গলের ·৩৭ গুণ, ইউরেনাসের ·৮৪ গুণ আর নেপচুনের ১·১৪ গুণ। অভিকর্ষ কী? একক ভরের কোনও বস্তুকে পৃথিবী যে বলে নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে তা-ই হ'ল পৃথিবীর অভিকর্ষ। পৃথিবীর অভিকর্ষকে ১ ধরে অন্য সব গ্রহ-উপগ্রহের অভিকর্ষ হিসেব করা হয়। কোনও বস্তুর ওজন হ'ল তার ভর আর অভিকর্ষের গুণফল। এক কিলো নুনকে পৃথিবীতে ওজন করলেও তার যা ভর (ভার নয়) হবে, চাঁদে, মঙ্গলে, বুধে কিংবা বিশ্বের যে কোন জায়গাতেই নেওয়া হ'ক না কেন, তার ভর একই থাকবে। কিন্তু ভার অর্থাৎ ওজন আলাদা হবে। কারণ —যা বললাম।

পৃথিবীতে ওজন = ভর × পৃথিবীর অভিকর্ষ,
বুধে " = " × বুধের "
বৃহস্পতিতে " = " × বৃহস্পতির "

কাজেই, পৃথিবীতে যে নুনের ওজন ১০০ কিলোগ্রাম, বুধে তারই ওজন ২৬ কিলোগ্রাম। বৃহস্পতিতে ২৬৪ কিলোগ্রাম। বিচিত্র ব্যবসায়ী এক টাকা কিলো দরে বুধে ২৬ টাকায় ২৬ কিলো নুন কিনে একই স্প্রিং ব্যালেন্সে বৃহস্পতিতে যখন ওজন করবেন তখন ঐ ২৬ কিলো নুনেরই ওজন দাঁড়াবে ২৬২ কিলো। এবার বৃহস্পতিতে এক টাকা কিলো দরে ঐ নুন বেচে পাওয়া যাবে ২৬৪ টাকা। কাজেই লাভ হচ্ছে ২৬৪ − ২৬ = ২৩৮ টাকা (গাড়ি ভাড়া বাদে)। ২৬ কিলোতে লাভ ২৩৮ টাকা। কাজেই, প্রতি কিলোগ্রামে লাভ প্রায় ৯ টাকা ১৫ পয়সা।

তেমনি, চাঁদে কিনে একই পরিমাণ জিনিস একই দরে পৃথিবীতে বিক্রি করলে ৬ গুণ দাম পাওয়া যাবে। এমন কি দার্জিলিং-এ এক কিলো চা কিনে একই দামে পুরীতে বেচলেও যৎসামান্য লাভ হবে। কারণ, সমুদ্র পৃষ্ঠের সমতলেই অভিকর্ষের মান সবচেয়ে বেশি। পাহাড়ে উঠলে বা খাদে নামলে—দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু অভিকর্ষ কমে যায়। তবে একটা কথা খেয়াল রেখো। এই রকম ব্যবসায় দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করা চলবে না। সব সময়ই স্প্রিং-তুলা ব্যবহার করতে হবে। এমন লাভের ব্যবসা করার সুযোগ হাতছাড়া কর না। আজই লেগে যাও।

৪, জ্ঞানেন্দ্র এ্যাভিন্যু, উত্তরপাড়া, হুগলী। ৭১২-২৫৮

টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগ্‌স্ আণ্ডার দি সী ঃ লেখা ও ছবি গৌতম কর্মকার

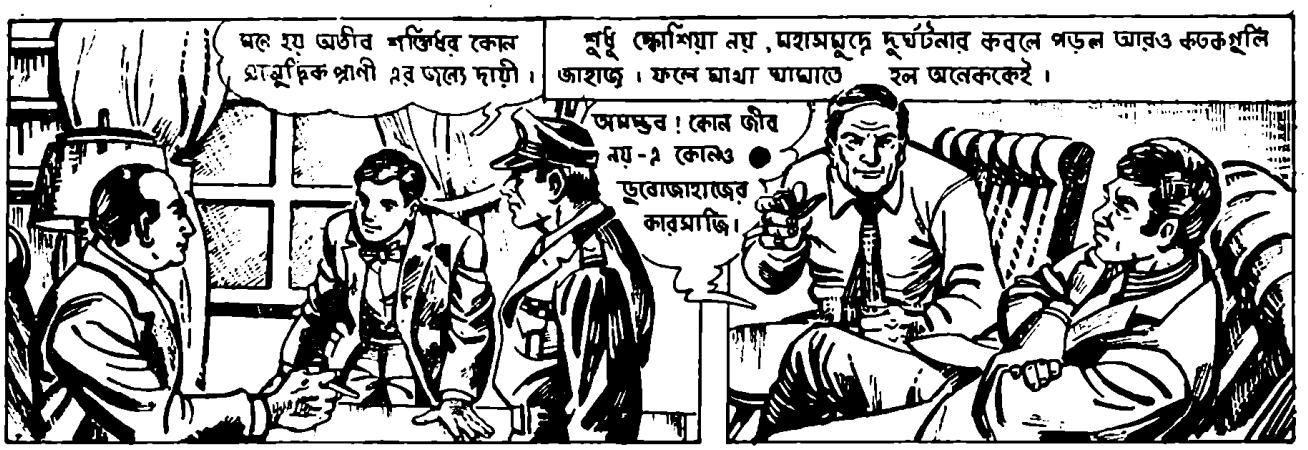

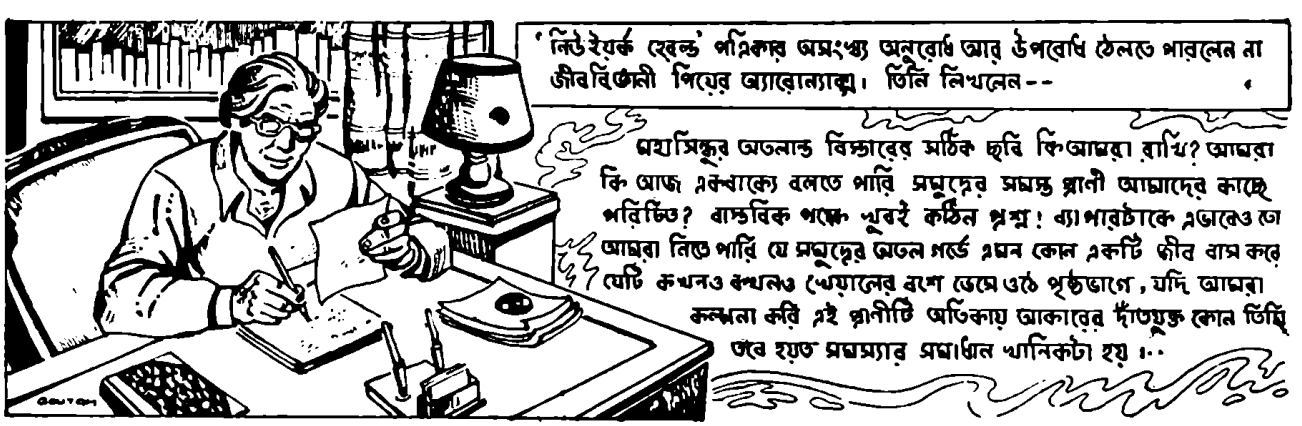

টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগ্‌স্ আণ্ডার দি সী : লেখা ও ছবি গৌতম কর্মকার

রসায়নের সহজপাঠ

অমরনাথ রায়

চুন তোমরা সবাই দেখেছ। চুন হলো ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO), সাদা রঙের কঠিন পদার্থ। জলে চুনের ঢেলাকে ফেললে চুন গরম হয়ে ফুটতে থাকে। তারপর চূর্ণ হয়ে যায়। ঐ সাদা চূর্ণ পদার্থকেই আমরা 'কলিচুন' বলে থাকি। রসায়নের ভাষায় কলিচুন হলো ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড [$Ca(oH)_2$]। চুন ও কলিচুন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী দুটি যৌগিক পদার্থ। নির্দিষ্ট ওজনের চুন থেকে উৎপন্ন কলিচুনের ওজনও ভিন্ন হয়। কলিচুন তৈরি করবার সময় তাপের উদ্ভব ঘটে। এটি একটি স্থায়ী পরিবর্তন। এই সব কারণে চুনের কলিচুনে পরিবর্তনকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলা হয়।

জলে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করে তার মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ চালালে জল বিশ্লিষ্ট হয়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসে পরিণত হয়। এই গ্যাস দুটির ধর্ম জলের ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আবার, এই গ্যাস দুটিকে উপযুক্ত ব্যবস্থা দ্বারা সংগ্রহ করে যদি ঠাণ্ডা করা হয়, তাহলে এরা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জল উৎপন্ন করবে না। তার মানে এটা একটা স্থায়ী পরিবর্তন। অতএব তড়িৎপ্রবাহ দ্বারা জলের তড়িৎ বিশ্লেষণে যে পরিবর্তন ঘটে তাও রাসায়নিক পরিবর্তন।

এই দৃষ্টান্ত দু'টি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ঃ— **"যে পরিবর্তনে পদার্থের অভ্যন্তরীণ গঠনের পরিবর্তন হয় এবং যে পরিবর্তনের ফলে একটি পদার্থ নতুন ধর্ম বিশিষ্ট অন্য একটি পদার্থে স্থায়ী ভাবে পরিবর্তিত হয়, তাকেই রাসায়নিক পরিবর্তন বলে।"**

রাসায়নিক পরিবর্তন আবার দু'রকম ঃ তাপ উৎপাদক পরিবর্তন এবং তাপ শোষক পরিবর্তন।

"যে সব রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় তাপের উদ্ভব ঘটে, সেই সব রাসায়নিক পরিবর্তনকে তাপ উৎপাদক পরিবর্তন, ইংরেজীতে Exothermic change **বলে।"**

আগেই বলেছি যে চুনে জল ঢাললে তা যখন কলিচুনে পরিবর্তিত হয়, তখন প্রচণ্ড তাপের উদ্ভব ঘটে। আবার কয়লাকে বায়ুতে পোড়ালে কয়লার উপাদান কার্বন এর সঙ্গে বায়ুর উপাদান অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এবং তার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। কয়লার এই রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। কাজেই এ দু'টি "তাপ-উৎপাদক পরিবর্তন" এর উদাহরণ।

আবার **"যে সব রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় তাপ শোষিত হয়, সেই সব রাসায়নিক পরিবর্তনকে 'তাপ-শোষক পরিবর্তন', ইংরেজীতে** Endothermic Change **বলে।"**

কার্বন ও সালফারের রাসায়নিক ক্রিয়ায় যখন কার্বন ডাই সালফাইড (CS_2) যৌগটি উৎপন্ন হয়, তখন তাপ শোষিত হয়। আবার, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় যখন নাইট্রিক অক্সাইড যৌগ (NO) উৎপন্ন হয়, তখনও তাপ শোষিত হয়।—অতএব এ দু'টি তাপশোষক পরিবর্তনের উদাহরণ।

অ্যাসিটিলিন নামে একটি গ্যাস আছে। ক্যালসিয়াম কার্বাইডের (CaC_2) সঙ্গে জলের বিক্রিয়ায় অ্যাসিটিলিন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাসের আণবিক সংকেত C_2H_2. তোমরা শুনলে অবাক হবে যে, এই গ্যাসের কাছে প্রচণ্ড শব্দ করলে গ্যাসটি তার উপাদান মৌল— কার্বন ও হাইড্রোজেনে ভেঙ্গে যায়।

আবার হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন গ্যাসের মিশ্রণকে প্রখর সূর্যের আলোয় ফেলে রাখলে ঐ দুই গ্যাসের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) নামে একটি গ্যাস উৎপন্ন হয়।

এমনিভাবে **"একটি পদার্থ বিশ্লিষ্ট হ'লে কিংবা দুই বা তার বেশী পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ ঘটলে পদার্থগুলির মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন আসে। এর ফলে ঐ পদার্থগুলির অণুর গঠনে যে রূপান্তর ঘটে, তাকে আমরা 'রাসায়নিক বিক্রিয়া' বলে থাকি।"**

যে পদার্থ বা পদার্থগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে তাদের বলা হয় **'বিকারক'**। আর বিক্রিয়ার ফলে নতুন ধর্মবিশিষ্ট যে সব পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাদের বলা হয় **'বিক্রিয়াজাত বা বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ'**।

তোমরা জান যে জিংক বা দস্তার সঙ্গে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় জিংক সালফেট ($ZnSO_4$) লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পদার্থ অর্থাৎ বিকারক

হলো জিংক ও সালফিউরিক অ্যাসিড। আর বিক্রিয়ার ফলে নতুন ধর্মবিশিষ্ট পদার্থ বা বিক্রিয়াজাত পদার্থ হলো জিংক সালফেট ও হাইড্রোজেন।

জিংক + লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড
(বিকারক)
→ জিংক সালফেট + হাইড্রোজেন
(বিক্রিয়াজাত পদার্থ)

একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার যে: **রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে একটি পদার্থ সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম বিশিষ্ট অন্য এক পদার্থে পরিণত হয় বটে, কিন্তু তাতে পদার্থের মূল উপাদান ও তাদের পরমাণুর সংখ্যার কোন পরিবর্তন হয় না।**

এবার রাসায়নিক সমীকরণের প্রসঙ্গে আসা যাক। রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ভাষায় লিখে বোঝাতে গেলে অনেকটা লিখতে হয়। তাতে সময় লাগে বেশী। রসায়নবিদেরা তাই রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সংক্ষেপে প্রকাশ করার এক উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তাঁরা এ কাজটা করে থাকেন রাসায়নিক সমীকরণের সাহায্যে।

"চিহ্ন ও সংকেতের সাহায্যে সংক্ষেপে রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রকাশ করার পদ্ধতিকে রাসায়নিক সমীকরণ বলে।"

রাসায়নিক সমীকরণ লেখার পদ্ধতি:

রাসায়নিক সমীকরণ লিখবার জন্যে কয়েকটি নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। সেই নিয়মগুলি নীচে উল্লেখ করা হলো।

(1) রাসায়নিক সমীকরণ লিখবার সময় মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের সংকেত লিখতে হয় অণু রূপে, পরমাণু রূপে নয়। এর কারণ, মৌল বা যৌগের মধ্যেকার পরমাণুগুলি স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না।

অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থগুলির অণু দু'টি ক'রে পরমাণু দিয়ে গড়া, অর্থাৎ এরা দ্বি-পরমাণুক। তাই রাসায়নিক সমীকরণে এই মৌলগুলির সংকেত যথাক্রমে O_2, H_2 এবং N_2 রূপে লিখতে হয়।

যে সব অণু এক-পরমাণুক, অর্থাৎ একটি মাত্র পরমাণু দিয়ে গড়া, তাদের অণুকে অবশ্য পরমাণুরূপে প্রকাশ করা হয়। যেমন Na, S, Fe, C, Mg, P ইত্যাদি।

(2) রাসায়নিক সমীকরণের মাঝখানে সমতা চিহ্ন (=) বসিয়ে তার বাঁ দিকে বিকারক পদার্থগুলির সংকেত ও ডান দিকে বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থগুলির সংকেত লিখতে হয়।

(3) একাধিক পদার্থের সংযোগে যদি বিক্রিয়া ঘটে এবং তার ফলে যদি একাধিক বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ উৎপন্ন হয়, তবে বিকারক পদার্থের সংকেতগুলিকে '+' চিহ্ন দিয়ে এবং বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের সংকেতগুলিকে '+' চিহ্ন দিয়ে যুক্ত করতে হয়।

মনে কর দুটি বিকারক পদার্থ হলো NaOH এবং HCl; আর বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ দুটি হলো NaCl ও H_2O; তাহলে এই নিয়ম অনুসারে রাসায়নিক সমীকরণের বাঁ দিকে লিখতে হবে $NaOH + HCl$ এবং ডান দিকে লিখতে হবে $NaCl + H_2O$।

(4) রাসায়নিক সমীকরণ লিখতে গেলে বিকারক ও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের পরিমাণের সমতা নির্ধারণ করতে হয়।

রাসায়নিক বিক্রিয়ার আগে বিকারক পদার্থের অণুর মধ্যে যত সংখ্যক পরমাণু থাকে, বিক্রিয়ার পরেও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের মধ্যে ঠিক তত সংখ্যক পরমাণু থাকে। সেই কারণে, বিক্রিয়ার আগে বিকারক পদার্থগুলির মোট ওজন, বিক্রিয়ার পরে বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের মোট ওজনের সমান হয়। সুতরাং বিক্রিয়ার আগের অণু-জোটকে বিক্রিয়ার পরের অণু-জোটের সঙ্গে সমতা চিহ্ন (=) দিয়ে সংযুক্ত ক'রে সুসমঞ্জস বা balanced রাসায়নিক সমীকরণ লিখতে হয়।

কস্টিক সোডা (সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড) ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে সোডিয়াম ক্লোরাইড নামক লবণ ও জল উৎপন্ন হয়। ভাষায় এতোটা না লিখে সুসমঞ্জস বা ব্যালান্সড্ রাসায়নিক সমীকরণের সাহায্যে একে সংক্ষেপে এমনিভাবে প্রকাশ করা হয়: $NaOH + HCl = NaCl + H_2O$.

(5) একাধিক বিকারকের মধ্যে '+' চিহ্নের অর্থ হলো 'বিক্রিয়া করে' এবং একাধিক বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের মধ্যে '+' চিহ্নের অর্থ হলো 'এবং'।

(6) বিক্রিয়ার আগে বা পরে একই পদার্থের অণুর সংখ্যা যদি একাধিক হয়, তবে সেই সংখ্যা অণুর সংকেতের আগে লিখতে হয়। যথা: $2H_2 + O_2 = 2H_2O$; $H_2 + Cl_2 = 2HCl$.

(7) যদি রাসায়নিক বিক্রিয়াটি উভমুখী হয়, তার মানে, বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলি পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে আবার যদি বিকারক পদার্থগুলি উৎপন্ন করে,

তাহ'লে সমতা চিহ্নের (=) জায়গায় উভমুখী চিহ্ন (⇄) বসাতে হয়। যথা $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$.

সুসমঞ্জস বা ব্যালান্সড্ রাসায়নিক সমীকরণ বলতে কি বোঝায় ?

যে রাসায়নিক সমীকরণের অন্তর্গত বিকারক ও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থগুলির অণুর সংকেতের মাঝে একটি সমতা চিহ্ন (=) থাকে এবং সেই সমতা চিহ্নের দু'পাশের প্রতিটি মৌলের পরমাণুর সংখ্যা সমান থাকে, সেই রাসায়নিক সমীকরণকে সুসমঞ্জস রাসায়নিক সমীকরণ বলে। সুসমঞ্জস রাসায়নিক সমীকরণের সমতা চিহ্নের (=) বাঁ দিকে বিকারক এবং ডান দিকে বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলির সঠিক সংকেত লেখা থাকে।

নীচে কয়েকটি সুসমঞ্জস রাসায়নিক সমীকরণ উল্লেখ করা হোল।

(i) $2H_2 + O_2 = 2H_2O$

(ii) $2Al + 3H_2SO_4 = Al_2(SO_4)_3 + 3H_2$

(iii) $2KClO_3 = 2KCl + 3O_2$

(iv) $C + 2H_2SO_4 = CO_2 + 2SO_2 = 2H_2O$.

রাসায়নিক সমীকরণ সুসমঞ্জস ক'রে লেখা না হ'লে সমতা চিহ্নের স্থানে→চিহ্ন বসাতে হয়। $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$ সমীকরণটি সুসমঞ্জস নয়, কারণ এতে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও জলকে অণুর সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা হলেও সমীকরণের→চিহ্নের উভয় দিকের অক্সিজেনের পরমাণুর সংখ্যা সমান নয়। এই সমীকরণটির সুসমঞ্জস রূপ হলো $2H_2 + O_2 = 2H_2O$.

আবার $MnO_2 + HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + H_2O$ সমীকরণটিও সুসমঞ্জস নয়, কারণ এই সমীকরণের→চিহ্নের দু'পাশের ক্লোরিন ও অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যা সমান নয়। এই সমীকরণটির সুসমঞ্জস রূপ হলো :

$MnO_2 + 4HCl = MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$.

সমীকরণকে সুসমঞ্জস করার প্রয়োজন হয় কেন ?

ডালটনের পরমাণুবাদ এবং ভরের নিত্যতা সূত্র থেকে জানা যায় যে, পরমাণুর ধ্বংস হয় না। পদার্থের পরিবর্তনে কেবলমাত্র তাদের ধর্ম ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং রাসায়নিক পরিবর্তনের আগে যত সংখ্যক পরমাণু থাকে, পরিবর্তনের পরেও ঠিক তত সংখ্যক পরমাণু থাকবে। সুতরাং রাসায়নিক বিক্রিয়া সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করবার সময় সমীকরণের সমতা চিহ্নের দু'-পাশের পরমাণুর সংখ্যা সমান রেখে সমীকরণটির সামঞ্জস্য বিধান করতে হয়। এক কথায়—ভরের নিত্যতা সূত্র ও ডালটনের পরমাণুবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যে প্রতিটি রাসায়নিক সমীকরণের সামঞ্জস্য বিধান একান্ত দরকার।

নির্ভুল ও সুসমঞ্জস রাসায়নিক সমীকরণ লেখার কয়েকটি উদাহরণ :

(i) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় জল উৎপন্ন হয়। তীর চিহ্নের বাঁ দিকে বিকারক ও ডান দিকে বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের নাম ভাষায় লিখে :

হাইড্রোজেন + অক্সিজেন→জল

পদার্থগুলিকে অণুর সংকেতে প্রকাশ করে :

$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$

তীর চিহ্নের দু'পাশের প্রতিটি মৌলের পরমাণু সংখ্যা সমান করে নিয়ে তীর চিহ্নের জায়গায় সামতা চিহ্ন (=) বসিয়ে :

$2H_2 + O_2 = 2H_2O$ (সুসমঞ্জস রাসায়নিক সমীকরণ)

(ii) লৌহ চূর্ণকে অক্সিজেনে দহন করলে ফেরিক অক্সাইড উৎপন্ন হয়। তীর চিহ্নের বাঁ দিকে বিকারক ও ডান দিকে বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের নাম ভাষায় লিখে :

আয়রন + অক্সিজেন→ফেরিক অক্সাইড পদার্থগুলিকে অণুর সংকেতে প্রকাশ করে :

$Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$

তীর চিহ্নের দু'পাশের প্রতিটি মৌলের পরমাণু সংখ্যা সমান ক'রে নিয়ে তীর চিহ্নের জায়গায় সমতা চিহ্ন (=) বসিয়ে :

$4Fe + 3O_2 = 2Fe_2O_3$ (সুসমঞ্জস রাসায়নিক সমীকরণ)

(iii) জলের সঙ্গে সোডিয়ামের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়।

তীর চিহ্নের বাঁ দিকে বিকারক ও ডান দিকে বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের নাম ভাষায় লিখে :

সোডিয়াম + জল→সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড + হাইড্রোজেন

পদার্থগুলিকে অণুর সংকেতে প্রকাশ ক'রে :

$Na + H_2O \rightarrow NaOH + H_2$

তীর চিহ্নের দু'পাশের প্রতিটি মৌলের পরমাণু সংখ্যা সমান ক'রে নিয়ে তীর চিহ্নের জায়গায় সমতা চিহ্ন (=) বসিয়ে :

$2Na + 2H_2O = 2NaOH + H_2 \uparrow$ (সুসমঞ্জস রাসায়নিক সমীকরণ)

লক্ষ্য কর যে H_2 এর পাশে ঊর্ধ্বমুখী তীর চিহ্ন (↑) বসানো হয়েছে। এই চিহ্নের দ্বারা গ্যাস উৎপন্ন হওয়া বোঝায়।

(iv) সোডিয়াম সালফেটের সঙ্গে বেরিয়াম ক্লোরাইডের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ক্লোরাইড ও বেরিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়।

তীর চিহ্নের বাঁ দিকে বিকারক ও ডান দিকে বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের নাম ভাষায় লিখে ঃ

সোডিয়াম সালফেট + বেরিয়াম ক্লোরাইড → সোডিয়াম ক্লোরাইড + বেরিয়াম সালফেট।

পদার্থগুলিকে অণুর সংকেতে প্রকাশ ক'রে ঃ

$$Na_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow NaCl + BaSO_4$$

তীর চিহ্নের দু'পাশের প্রতিটি মৌলের পরমাণু সংখ্যা সমান করে নিয়ে তীর চিহ্নের জায়গায় সমতা চিহ্ন (=) বসিয়ে ঃ

$$Na_2SO_4 + BaCl_2 = 2NaCl + BaSO_4(\downarrow)$$

(সুসমঞ্জস রাসায়নিক সমীকরণ)

লক্ষ্য কর যে, $BaSO_4$ এর পাশে নিম্নাভিমুখী তীর চিহ্ন বসানো হয়েছে। এই চিহ্ন (↓) দ্বারা পদার্থের অধঃক্ষিপ্ত কঠিন অবস্থা বোঝানো হয়।

(v) অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, অ্যামোনিয়া ও জল উৎপন্ন হয়।

তীর চিহ্নের বাঁ দিকে বিকারক ও ডান দিকে বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের নাম ভাষায় লিখে ঃ

অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড + ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড → ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড + অ্যামোনিয়া + জল।

পদার্থগুলিকে অণুর সংকেতে প্রকাশ ক'রে ঃ

$$NH_4Cl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + NH_3 + H_2O.$$

তীর চিহ্নের দু'পাশের প্রতিটি মৌলের পরমাণু সংখ্যা সমান ক'রে নিয়ে তীর চিহ্নের জায়গায় সমতা চিহ্ন (=) বসিয়ে ঃ

$$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 = CaCl_2 + 2NH_3 + 2H_2O$$

(সুসমঞ্জস রাসায়নিক সমীকরণ)

রাসায়নিক সমীকরণের তাৎপর্য ঃ

রাসায়নিক সমীকরণ মাত্রেই গুণগত (Qualitative) এবং পরিমাণগত (Quantitative)—এই দু'রকম তথ্যই প্রকাশ করে।

যে কোনও সুসমঞ্জস রাসায়নিক সমীকরণ দেখে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারি ঃ

(i) বিকারক ও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের নাম অর্থাৎ পরিচয়।

(ii) বিকারক ও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের অণুর সংখ্যা।

(iii) বিক্রিয়ার আগে ও পরে মোট পরমাণুর সংখ্যা।

(iv) বিকারক ও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের ওজন।

(v) বিকারক ও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ গ্যাসীয় হ'লে তাদের আপেক্ষিক আয়তন।

উদাহরণ ঃ

(ক) $N_2 + 3H_2 = 2NH_3$ রাসায়নিক সমীকরণটি থেকে আমরা জানতে পারি যে ঃ

(i) নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন নামক মৌলিক পদার্থ দু'টির সংযোগে অ্যামোনিয়া (NH_3) নামক যৌগ গঠিত হয়।

(ii) একটি নাইট্রোজেন অণু এবং তিনটি হাইড্রোজেন অণু যুক্ত হ'য়ে দু'টি অ্যামোনিয়া অণু গঠন করে।

(iii) বিক্রিয়ার আগে মোট পরমাণুর সংখ্যা $2 + (3 \times 2) = 8$ এবং বিক্রিয়ার পরে মোট পরমাণুর সংখ্যা $2 + 6 = 8$

(iv) বিক্রিয়ার আগে বিকারকদের মোট ওজন $28 + 6 = 34$ ভাগ এবং বিক্রিয়ার পরে বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের মোট ওজন $2(14 + 3) = 34$ ভাগ।

(v) এক আয়তন নাইট্রোজেন এবং তিন আয়তন হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় দুই আয়তন অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়।

(খ) $2H_2 + O_2 = 2H_2O$ রাসায়নিক সমীকরণটি থেকে আমরা জানতে পারি যে ঃ

(i) নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটার ফলে জল উৎপন্ন হয়।

(ii) 2 অণু হাইড্রোজেন এবং 1 অণু অক্সিজেন যুক্ত হ'য়ে 2 অণু জল উৎপন্ন হয়।

(iii) বিক্রিয়ার আগে বিকারক পদার্থগুলির মোট পরমাণুর সংখ্যা $4 + 2 = 6$ এবং বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থটির অন্তর্গত মোট পরমাণুর সংখ্যা $2(2 + 1) = 6$.

(iv) বিক্রিয়ার আগে বিকারক পদার্থগুলির মোট ওজন $4 + 32 = 36$ ভাগ এবং বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থটির ওজন $2[(2XI) + 16] = 36$ ভাগ।

(গ) $C + O_2 = CO_2$ রাসায়নিক সমীকরণটি থেকে আমরা জানতে পারি যে ঃ

(i) কার্বন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

(ii) একটি কার্বন পরমাণু একটি অক্সিজেন অণুর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে একটি কার্বন ডাই অক্সাইড অণু উৎপন্ন করে।

(iii) 12 ভাগ ওজনের কার্বন $2X16=32$ ভাগ ওজনের অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে $[12+(2X16)]=44$ ভাগ ওজনের কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে। অর্থাৎ বিক্রিয়ার আগে কার্বন ও অক্সিজেনের সম্মিলিত ওজন (44 ভাগ) বিক্রিয়ার পরে উৎপন্ন কার্বন ডাই অক্সাইডের ওজনের (44 ভাগ) সমান।

(iv) 12 গ্রাম কার্বন প্রমাণ অবস্থায় 22·4 লিটার আয়তনের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে 22·4 লিটার আয়তন কার্বন ডাই অক্সাইড (প্রমাণ অবস্থায়) উৎপন্ন করে।

রাসায়নিক সমীকরণ থেকে এতগুলি তথ্য জানা গেলেও কিছু তথ্য আছে, যা জানা যায় না। যে তথ্য-গুলি জানা যায় না, সেগুলি রাসায়নিক সমীকরণের অসম্পূর্ণতা বা সীমাবদ্ধতা।

রাসায়নিক সমীকরণের সীমাবদ্ধতা :

রাসায়নিক সমীকরণ থেকে আমরা যে তথ্যগুলি জানতে পারি না, সেগুলি হলো :—

(i) বিকারক ও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থগুলির ভৌত অবস্থা অর্থাৎ পদার্থগুলি কঠিন, তরল কিংবা গ্যাসীয়—তা সমীকরণ দেখে বোঝা যায় না।

(ii) বিক্রিয়ার ফলে তাপ উৎপন্ন হবে, না তাপ শোষিত হবে, তাও রাসায়নিক সমীকরণ থেকে বোঝা যায় না।

(iii) বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হ'তে কতো সময়ের প্রয়োজন, তাও সমীকরণ থেকে বোঝা যায় না।

(iv) রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাবার শর্ত অর্থাৎ তাপ, চাপ, আলোক, তড়িৎশক্তি অথবা অনুঘটকের প্রয়োজন আছে কিনা, তাও সমীকরণ থেকে জানা যায় না।

(v) বিক্রিয়া উভমুখী কিনা, তা জানা যায় না সমীকরণ দেখে।

উদাহরণ :

(i) $C+H_2O=CO+H_2$ সমীকরণে ব্যবহৃত পদার্থগুলির মধ্যে কোন্‌টির ভৌত অবস্থা (কঠিন, তরল বা গ্যাসীয়) কেমন, তা জানা যায় না।

$Cu+4HNO_3=Cu(NO_3)_2+2NO_2+2H_2O$ বিক্রিয়াটিতে উষ্ণ ও গাঢ় HNO_3 প্রয়োজন হয়। কিন্তু রাসায়নিক সমীকরণটি দেখে তা জানা যায় না। তার মানে, বিকারক ও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের ঘনত্ব ও উষ্ণতা সমীকরণ ব্যক্ত করে না।

(ii) $N_2+3H_2=2NH_3$ বিক্রিয়াটি তাপ উৎপাদক। এই বিক্রিয়ায় 24,000 ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হয়। কিন্তু সমীকরণটি থেকে এ বিষয় জানা যায় না।

(iii) $H_2+F_2=2HF$ বিক্রিয়াটি খুব দ্রুত হয়, আবার $H_2+I_2=2HI$ বিক্রিয়াটি খুব ধীরে হয়। এই দুই বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে কতো সময়ের প্রয়োজন হয়, তা রাসায়নিক সমীকরণ থেকে জানা যায় না।

(iv) $N_2+3H_2=2NH_3$ বিক্রিয়াটি সাধারণ চাপ ও তাপে ঘটে না। 200 বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও 550° সেলসিয়াস উষ্ণতায় ও লৌহচূর্ণ অনুঘটকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়াটি ঘটে। কিন্তু সমীকরণে এগুলি অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ার শর্তগুলি প্রকাশ পায় না।

(v) $N_2+3H_2=2NH_3$ বিক্রিয়াটি উভমুখী। সমীকরণ কিন্তু তা ব্যক্ত করে না।

রাসায়নিক সমীকরণকে সুসমঞ্জস বা ব্যালান্স করার পদ্ধতি :

রাসায়নিক সমীকরণকে ব্যালান্স করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি জানা দরকার।

(i) রাসায়নিক বিক্রিয়াটিতে কি কি পদার্থ উৎপন্ন হয়।

(ii) বিকারক ও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থগুলির সঠিক সংকেত।

(iii) বিক্রিয়ার আগে বা পরে পদার্থের অণু এক বা একাধিক সংখ্যায় থাকতে পারে। অণুর সংখ্যা কখনও ভগ্নাংশ হয় না।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতি (Hit and trial method) :

(ক) এই পদ্ধতি অনুসারে→চিহ্নের বাঁ দিকে বিকারক ও ডান দিকে বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থগুলির অণুর সংকেত লেখা হয়। যেমন, পটাসিয়াম ক্লোরেটকে উত্তপ্ত করলে পটাসিয়াম ক্লোরাইড এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। এখন মাঝখানে→চিহ্ন বসিয়ে তার বাঁ দিকে বিকারক ও ডান দিকে বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থগুলির সংকেত লিখলে দাঁড়ায় :— $KClO_3\rightarrow KCl+O_2$

যেহেতু বিকারক ও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের অণুগুলির মধ্যে বিভিন্ন মৌলের পরমাণুগুলির সংখ্যা সমান থাকবেই, সেইজন্যে দু'পাশে পরমাণুর সংখ্যা গুণে, বা দরকার হ'লে দু'পাশে অণুগুলির সংখ্যা বাড়িয়ে দেখতে হবে যে, দু'পাশে পরমাণুর সংখ্যা সমান হলো কিনা। যখন ডান দিকের পরমাণুর সংখ্যা বাঁ দিকের পরমাণুর সংখ্যার

সমান হয়, তখন বিকারক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের মাঝে সমতা চিহ্ন (=) দিয়ে সমীকরণটিকে ব্যালান্স করা হয়। উপরের বিক্রিয়াটিতে দেখা যায় যে, বাঁ দিকে 2 অণু $KClO_3$ ও ডান দিকে 2 অণু KCl এবং 3 অণু O_2 করলে, প্রত্যেকটি পরমাণুর সংখ্যা উভয় দিকে সমান হয়। অতএব সুসমঞ্জস সমীকরণটি হবে ঃ

$$2KClO_3 = 2KCl + 3O_2.$$

(খ) ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় ম্যাঙ্গানাস ক্লোরাইড, ক্লোরিন ও জল উৎপন্ন হয়।

$$MnO_2 + HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + H_2O$$

এখানে সমীকরণের দু'পাশের ক্লোরিন ও অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যা সমান নয়। সুতরাং সমীকরণটি অসম্পূর্ণ। এটিকে ব্যালান্স করতে হ'লে 4টি HCl অণু নিলে দু'দিকের ক্লোরিন পরমাণুর সমতা রক্ষা পাবে এবং সঙ্গত কারণেই 2টি H_2O অণু বসাতে হবে। অতএব সুসমঞ্জস রাসায়নিক সমীকরণটি হবে এই রকম ঃ

$$MnO_2 + 4HCl = MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O.$$

(গ) অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের মিশ্রণকে উত্তপ্ত করলে অ্যামোনিয়া গ্যাস, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও জল উৎপন্ন হয়।

$$NH_4Cl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + NH_3 + H_2O$$

এখন→চিহ্নের দু'পাশের ক্লোরিন পরমাণুর সংখ্যা সমান সমান করার উদ্দেশ্যে NH_4Cl কে 2 দিয়ে গুণ করতে হবে। তাহ'লে পাওয়া যাবে ঃ

$$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + NH_3 + H_2O.$$

এবার→চিহ্নের দু'পাশের নাইট্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা সমান সমান করার উদ্দেশ্যে NH_3-কে 2 দিয়ে গুণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে সমীকরণটি হবে এই রকম ঃ

$$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + 2NH_3 + H_2O.$$

সবশেষে→চিহ্নের দু'পাশের অক্সিজেন পরমাণু সংখ্যার মধ্যে সমতা বিধানের জন্যে H_2O-কে 2 দিয়ে গুণ করতে হবে। এটি করলে→চিহ্নের দু'পাশের হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যাও সমান সমান হবে। তার ফলে চূড়ান্ত সুসমঞ্জস সমীকরণটি দাঁড়াবে এই রকম ঃ

$$2NH_4Cl + Ca(OH)_2 = CaCl_2 + 2NH_3 + 2H_2O.$$

(ঘ) কপারকে গাঢ় H_2SO_4 সহযোগে উত্তপ্ত করলে পাওয়া যায় সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস, কপার সালফেট লবণ ও জল।

$$Cu + H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + H_2O.$$

→চিহ্নের দু'পাশের সালফার পরমাণুর সংখ্যা সমান সমান করার জন্যে H_2SO_4-কে 2 দিয়ে গুণ করা দরকার। তাহ'লে পাওয়া যাবে ঃ

$$Cu + 2H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + {}_2HO.$$

এবার→চিহ্নের দু'পাশের হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা সমান সমান করার জন্যে H_2O-কে 2 দিয়ে গুণ করতে হবে। তাহ'লেই পাওয়া যাবে সুসমঞ্জস সমীকরণটি এবং সেটি হলো ঃ

$$Cu + 2H_2SO_4 = CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O.$$

(ঙ) অ্যাসিটিলিন অক্সিজেনে দহন করলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল উৎপন্ন হয়।

$$C_2H_2 + O \rightarrow CO_2 + H_2O.$$

→চিহ্নের দু'পাশের কার্বন পরমাণুর মধ্যে সমতা আনার জন্যে প্রথমে CO_2-কে 2 দিয়ে গুণ করতে হবে। তাহলে পাওয়া যাবে ঃ

$$C_2H_2 + O \rightarrow 2CO_2 + H_2O.$$

এর ফলে→চিহ্নের ডান দিকে অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যা দাঁড়াবে 5. অতএব→চিহ্নের দু'পাশের অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যায় সমতা আনার জন্যে O-কে 5 দিয়ে গুণ করতে হবে।

$$C_2H_2O + 5[O] \rightarrow 2CO_2 + H_2O$$

এই সমীকরণে→চিহ্নের বাঁ দিকে অক্সিজেন আছে পরমাণুরূপে। সেটিকে আণবিক অক্সিজেনে পরিণত করে সমীকরণ গঠন করার জন্যে→চিহ্নের দু'পাশের পদার্থগুলির প্রত্যেকটিকে 2 দিয়ে গুণ করতে হবে। তখন পাওয়া যাবে সুসমঞ্জস সমীকরণটি।

$$2C_2H_2 + 5O_2 = 4CO_2 + 2H_2O.$$

॥ প্রশ্নাবলী ॥

1. 'রাসায়নিক পরিবর্তন' বলতে কি বোঝ? এই পরিবর্তনের একটি উদাহরণ দাও।
2. 'রাসায়নিক বিক্রিয়া' কাকে বলে? রাসায়নিক বিক্রিয়ার একটি উদাহরণ দাও।
3. উদাহরণ সহযোগে তাপ উৎপাদক এবং তাপ শোষক পরিবর্তন ব্যাখ্যা কর।
4. বিকারক ও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ বলতে কি বোঝ?
5. 'রাসায়নিক সমীকরণ' কাকে বলে? একটি

সুসমঞ্জস রাসায়নিক সমীকরণ লেখ।

6. রাসায়নিক সমীকরণকে সুসমঞ্জস করার প্রয়োজন কি?

7. রাসায়নিক সমীকরণের মধ্যে ↓ এবং ↑ চিহ্ন দু'টি থাকলে কি বুঝতে হবে?

8. $N_2+3H_2=2NH_3$ রাসায়নিক সমীকরণটি থেকে আমরা কি কি বিষয় জানতে পারি?

9. রাসায়নিক সমীকরণের সীমাবদ্ধতাগুলি সাধারণ-ভাবে উল্লেখ কর।

10. সুসমঞ্জস রাসায়নিক সমীকরণ কাকে বলে? রাসায়নিক সমীকরণে → চিহ্ন এবং = চিহ্নের অর্থ কি?

11. কোনও রাসায়নিক সমীকরণকে সুসমঞ্জস করতে হ'লে কি কি বিষয় জানা দরকার?

12. রাসায়নিক সমীকরণকে সুসমঞ্জস করার পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতির একটি উদাহরণ দাও।

13. নীচে কয়েকটি রাসায়নিক সমীকরণ ভাষায় লেখা আছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতির সাহায্যে সেগুলিকে সুসমঞ্জস সমীকরণে পরিণত কর।

(i) সোডিয়াম কার্বনেট + নাইট্রিক অ্যাসিড → সোডিয়াম নাইট্রেট + কার্বন ডাইঅক্সাইড + জল।

(ii) ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড + কার্বন ডাইঅক্সাইড → ক্যালসিয়াম কার্বনেট + জল।

তাপ

(iii) লেড নাইট্রেট —→ লেড অক্সাইড + নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড + অক্সিজেন।

(iv) ক্যালসিয়াম + জল → ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড + হাইড্রোজেন।

(v) জিংক + সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড → সোডিয়াম জিংকেট + হাইড্রোজেন।

(vi) সিলভার অক্সাইড + হাইড্রোজেন পার অক্সাইড → সিলভার + জল + অক্সিজেন।

14. পরীক্ষা-নিরীক্ষা পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত রাসায়নিক সমীকরণগুলিকে সুসমঞ্জস কর:—

(i) $FeS+O_2\rightarrow FeO+SO_2$

(ii) $NH_3+Na\rightarrow NaNH_2+H_2$

(iii) $C_2H_4+O_2\rightarrow CO_2+H_2O$

(iv) $Mg+HNO_3\rightarrow Mg(NO_3)_2+NH_4NO_3+H_2O$

(v) $CaCN_2+H_2O\rightarrow CaCO_3+NH_3$

15. অক্সিজেন বহুল কতকগুলি যৌগকে তাপ দিলে অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হয়। এ রকম কয়েকটি রাসায়নিক সমীকরণ নীচে দেওয়া হলো। এগুলিকে ব্যালান্স কর:

(i) $2KClO_3\rightarrow KCl+O_2$

(ii) $KMnO_4\rightarrow K_2MnO_4+MnO_2+O$

(iii) $Ag_2O\rightarrow 4Ag+O$

(iv) $HgO\rightarrow Hg+O_2$

(v) $Ca(ClO_3)_2\rightarrow CaCl_2+O_2$

16. শূন্যস্থান পূরণের দ্বারা নীচের সমীকরণগুলিকে ব্যালান্স কর:

(i) $CaH_2+H_2O\rightarrow —+H_2$

(ii) $HNO_3 \xrightarrow{\text{তাপ}} NO_2+—+—$

(iii) $Ca(HCO_3)_2 \xrightarrow{\text{তাপ}} CaCO_3+—+—$

(iv) $NH_4NO_3 \xrightarrow{\text{তাপ}} N_2+—$

(v) $FeS_2+O\rightarrow Fe_2O_3+—$

17. নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কি ঘটে তা ভাষায় লেখ ও সুসমঞ্জস সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ কর:—

(i) পরীক্ষা নলে পটাসিয়াম নাইট্রাইট নিয়ে তীব্র ভাবে উত্তপ্ত করা হলো।

(ii) ফেরাস সালফেট কেলাসকে উত্তপ্ত করা হলো।

(iii) শীতল জলের সঙ্গে ধাতব সোডিয়ামের বিক্রিয়া ঘটানো হলো।

(iv) চুনের ঢেলাকে জলের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো।

18. নিম্নলিখিত যৌগগুলি থেকে কিভাবে অক্সিজেন পাওয়া যেতে পারে তা সুসমঞ্জস রাসায়নিক সমীকরণ সহযোগে ভাষায় লেখ:

(i) BaO_2 (ii) MnO_2 (iii) Na_2O_2
(iv) $KMnO_4$ (v) KNO_3

বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র

লেখা ও ছবি : দিলীপ দাস

বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র ঃ লেখা ও ছবি ঃ দিলীপ দাস

১

কিছু পরিমিতি-সমস্যা

ডঃ অসীম মুখোপাধ্যায়

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম বর্ষ ২য় সংখ্যায় (পৃঃ২৪) প্রকাশিত 'বিখ্যাত প্রশ্নটি' এবং তার উত্তর সমগ্র পাঠক-বর্গকে বিশেষ চিন্তিত করে তুলেছে। নৌকা থেকে পাথরগুলো জলে ফেলে দিলে দীঘির জলের তল উঠে যাওয়ার কথা! যা হোক এই বিখ্যাত প্রশ্নটির সূত্র ধরে কিছু পরিমিতি বিষয়ক সমস্যাদির অবতারণা স্বচ্ছন্দে করা যেতে পারে।

প্রথমে একটি সাধারণ বা সহজ সমস্যা উপস্থাপন করা হচ্ছে। জলভর্তি (বা তরল পদার্থ) একটি পাত্রে একটি বস্তু (কঠিন) ডোবান হচ্ছে যা জলের সংস্পর্শে গলে যায় না বা জল শোষণ করে না। স্পষ্টই বস্তুটি ডোবার ফলে পাত্র থেকে কিছু পরিমাণ জল উপ্‌চে পড়বে। প্রশ্ন হ'ল কি পরিমাণ জল উপ্‌চে পড়বে।

যে কোন বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম হলো তার অবস্থান বা অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কিছু স্থান দখল করা। কঠিন পদার্থ (তরলও) তার আয়তনের সমান পরিমাণ স্থান অধিকার করে। নিমজ্জিত বস্তুটিকে স্থান ছেড়ে দিতে বস্তুটির সম-আয়তন জল অপসারিত হবে। পাত্রে কোন ফাঁকা জায়গা না থাকার জন্যে তরল পদার্থের স্বাভাবিক ধর্মানুযায়ী (আকারহীনতা এবং উন্মুক্ত তলের অনুভূমিকত্ব) বস্তুটির আয়তনের সমপরিমাণ জল পাত্র থেকে উপ্‌চে পড়বে।

এখন মনে করা যেতে পারে যে পাত্রটি সম্পূর্ণ জল ভর্তি নয়, পাত্রে যথেষ্ট ফাঁকা স্থান আছে এবং বস্তুটি জলমগ্ন হলে পাত্র থেকে জল উপ্‌চে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এই ক্ষেত্রে জলমগ্ন বস্তুকে স্থান করে দিতে, পাত্রস্থিত জলের কিছু অংশ ফাঁকা জায়গায় অপসারিত হবে। ফলে জলের তল ওপরে উঠবে। জলের তল কতটা উঠবে তা নির্ভর করবে জলাধার পাত্রটির আকারের ওপর। জলাধারটি যদি একটি চোঙ বা বেলন হয়, তাহলে উত্থিত জল একটি চোঙের আকার ধারণ করবে যার ভূমি-ব্যাসার্ধ পাত্রটির ভূমি-ব্যাসার্ধের সমান হবে। যদি উত্থিত জলের উচ্চতা h হয়, জলধারক চোঙের ভূমি-ব্যাসার্ধ R হয় এবং বস্তুটির আয়তন V হয় তাহলে ঃ

উত্থিত জলের আয়তন = অপসারিত জলের আয়তন = নিমজ্জিত বস্তুটির আয়তন। এই তত্ত্ব থেকে পাওয়া যাবে ঃ

$$\pi R^2 h = V \quad \text{বা,} \quad h = \frac{V}{\pi R^2}$$

যেখানে $\pi = \frac{22}{7}$ বা 3.1416 (আসন্নমান) একটি ধ্রুবক।

লক্ষণীয় h-এর মান নির্ণয়ে পাত্রস্থিত জলের পরিমাণের হিসাব আদৌ লাগছে না। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থাৎ জলধারটি অন্য আকারের হলে, h নির্ণয়ের জন্য পাত্রস্থিত জলের পরিমাণ হিসেবে লাগতে পারে।

আলোচ্য সমস্যায় বস্তুটি যদি সম্পূর্ণ নিমজ্জিত না হয় এবং তার কিছু অংশ জলের ওপরে ভাসতে থাকে তাহলে বস্তুটির কেবলমাত্র নিমজ্জিত অংশের সমপরিমাণ জল অপসারিত হবে এবং পূর্ব বর্ণিত উপায়ে h-এর মান নির্ণয় করা যাবে। নিঃসন্দেহে এই অবস্থায় নিমজ্জিত বস্তুটি পাত্র থেকে তুলে নিলে, জলের তল তার পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবে। কিন্তু বস্তু নিমজ্জনের ফলে পূর্বেই যদি কিছু জল পাত্র থেকে উপচে পড়ে গিয়ে থাকে তাহলে বস্তুটি জল থেকে তুলে নিলে জলের তল পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবে না। উপচান জলের পরিমাণ V ঘন একক হলে, নিমজ্জিত বস্তুটি জল থেকে তুলে নিলে পাত্রে জলতলের উচ্চতা প্রাথমিক অবস্থা থেকে $V/\pi R^2$ পরিমাণ হ্রাস পাবে।

ওপরের আলোচনায় ধারণা করা হয়েছে যে বস্তুটি জলের সংস্পর্শে এলে গলে যায় না এবং কোন জল শোষণও করে না। বস্তুটি যদি এমন প্রকৃতির হয় যে জলের সংস্পর্শে এলে গলে যায় না বটে, কিন্তু জল শোষণ করে এবং সেজন্য বস্তুটির ঘনমানের কোন পরিবর্তন ঘটে না, তাহলে জলে বস্তুটি নিমজ্জনের দরুন পাত্রে (চোঙে) উত্থিত জলের তলের উচ্চতা আগের মত $V/\pi R^2$ হবে না। কারণ বস্তুটির দ্বারা অপসারিত জলের কিছু অংশ শোষণ হেতু বস্তুটির মধ্যে স্থান পাবে। বস্তুটি যদি তার আয়তনের R অংশ জল শোষণ করতে সমর্থ হয়, তাহলে শোষিত জলের পরিমাণ = KV এবং

উত্থিত জলের আয়তন = বস্তুটির আয়তন – শোষিত আয়তন $= V - KV = (I - K)\,V$.

তাহলে পূর্ববর্ণিত পন্থায় পাত্রে উত্থিত জলের উচ্চতা হবে $(I—K)V/\pi R^2$.

এখন (শোষণ এবং নিমজ্জনের পর) যদি বস্তুটি পাত্র থেকে তুলে নেওয়া হয়, তাহলে জলের তল প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে যাবে না। মনে রাখা দরকার যে এই আলোচনায় জলধারক পাত্রটির মধ্যে যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা আছে ধরে নেওয়া হয়েছে, যাতে বস্তুনিমজ্জনের ফলে কোন জল উপ্‌চে পড়ছে না। স্পষ্ট যে নিমজ্জিত বস্তুটি জল থেকে তুলে নিলে বস্তুটির সঙ্গে কিছু জলও (শোষিত জল) বহিষ্কৃত হবে। পরিণামে পাত্রে জলের পরিমাণ হ্রাস পাবে। বস্তুটি জল থেকে তুলে নেওয়ায় পাত্রে (চোঙ) যদি জলের উচ্চতা প্রাথমিক অবস্থা থেকে h পরিমাণ হ্রাস পায়, তাহলে

$$\pi R^2 h = KV \text{ বা, } h = KV/\pi R^2.$$

কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় জলাধারটি সম্পূর্ণ জলভর্তি থাকত তাহলে বস্তুটি নিমজ্জনের ফলে যে পরিমাণ জল পাত্র থেকে উপচে পড়ত তা হ'ল ঃ

বস্তুটির আয়তন—শোষিত জলের আয়তন $= V—KV = (I-K)V$।

এরপর বস্তুটি জল থেকে তুলে নিলে, পাত্র থেকে জলের পরিমাণ মোট হ্রাস পাবে, উপচে পড়া জলের পরিমাণ+শোষিত জলের পরিমাণ $= (I—K)V + KV = V$। এই অপসারিত জল পাত্রে থাকলে তার উচ্চতা হত $V/\pi R^2$, অর্থাৎ জলের তল প্রাথমিক অবস্থা (পরিপূর্ণতা) থেকে $V/\pi R^2$ পরিমাণ নিচে নেমে আসবে। এও লক্ষণীয় যে এই ক্ষেত্রে জলতলের উচ্চতার হ্রাস বস্তুটির শোষণ ক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল নয়।

এবার মনে করি বস্তুটি একটি খালি চোঙের মধ্যে আছে এবং সেই চোঙটি জলধারক পাত্রে (চোঙ) উল্লম্ব অবস্থায় সর্বদা ভাসমান। এখন বস্তুটির ওজন W একক (গ্রাম বা পাউণ্ড) এবং ভাসমান চোঙটির ওজন W′ একক হলে, আর্কিমেডিসের প্লবতা সূত্রানুযায়ী।

বস্তুসহ ভাসমান পাত্রটির ওজন = নিমজ্জিত পাত্রটির দ্বারা অপসারিত জলের ওজন বা, $W + W' = \pi r^2 h' w$

যেখানে r = ভাসমান চোঙের ভূমি-ব্যাসার্ধ ঃ

h′ = ভাসমান চোঙের যে পরিমাণ দৈর্ঘ্য জলে নিমজ্জিত

w = জলের একক আয়তনের ওজন

$$\therefore \quad h' = \frac{W + W'}{\pi r^2 w}$$

এখন ভাসমান চোঙ থেকে বস্তুটি তুলে নেওয়া হল। ভার লাঘব হওয়ায় ভাসমান (উল্লম্ব) চোঙটির নিমজ্জিত দৈর্ঘ্য হ্রাস পাবে। এই অবস্থায় চোঙের নিমজ্জিত অংশের দৈর্ঘ্য যদি h″ হয়, তাহলে আর্কিমেডিসের উক্ত নীতি অনুযায়ী,

নিমজ্জিত পাত্রটির দ্বারা অপসারিত জলের ওজন = কেবলমাত্র পাত্রটির ওজন বা, $\pi r^2 h'' w = W'$ বা, $h'' = W'/\pi r^2 w$

$\therefore$ ভাসমান পাত্রের নিমজ্জিত অংশের দৈর্ঘ্যের হ্রাস

$$= h' — h''$$

$$= \frac{W + W'}{\pi r^2 w} - \frac{W'}{\pi r^2 w}$$

$$= \frac{W}{\pi r^2 w}$$

এবং অপসারিত জলের আয়তনের হ্রাস $= \pi r^2 (h' — h'')$

$$= \pi r^2 \frac{W}{\pi r^2 w}$$

$$= \frac{W}{w} = \frac{\text{বস্তুটির ওজন}}{\text{একক আয়তন জলের ওজন}}$$

ভাসমান পাত্রের নিমজ্জিত অংশের দৈর্ঘ্য হ্রাস পাওয়ার ফলে যে ফাঁকা স্থানের উদ্ভব হবে, জলধারক পাত্রের মধ্যস্থিত জল সেই স্থান পূরণ করবে। কাজেই জলধারক পাত্রে জলের উচ্চতা (বা গভীরতা) হ্রাস পাবে। মনে করা যাক, ভাসমান পাত্রে বস্তুটি থাকাকালীন জলধারক পাত্রে জলের উচ্চতা (সর্বাধিক) ছিল H, তাহলে

জলধারক পাত্রে জলের আয়তন = H উচ্চতায় জলধারক পাত্রে (চোঙ) সম্পূর্ণ জলের আয়তন—ভাসমান পাত্রের (চোঙ) নিমজ্জিত অংশ কর্তৃক অধিকৃত স্থানের আয়তন

$$= \pi R^2 H — \pi r^2 h'$$

$$= \pi(R^2 H - r^2 h') \ldots (1)$$

বস্তুটি ভাসমান পাত্র থেকে তুলে নেওয়ার পর জলধারক পাত্রে জলের উচ্চতা পরিবর্তিত হয়ে যদি H′ হয়, তাহলে পূর্বদর্শিত নিয়মানুযায়ী জলধারক পাত্রে জলের আয়তন হবে, $\pi(R^2 H' - r^2 h'') \ldots (2)$। এখন পাত্রস্থিত জলের পরিমাণের কোন হ্রাস বৃদ্ধি না হওয়ায় নিঃসন্দেহে (1) এবং (2) থেকে লেখা যায়,

$$\pi(R^2 H - r^2 h') = \pi(R^2 H' — r^2 h'')$$

বা, $R^2(H - H') = r^2(h' - h'') = r^2 W/\pi r^2 w$

$$= W/\pi w$$

বা, $H — H' = W/\pi R^2 w \ldots (3)$

এবার বস্তুটি জলধারক পাত্রে নিমজ্জিত করা হলো। ফলে, জলধারক পাত্রে জলের উচ্চতা (H′ থেকে) বৃদ্ধি পাবে, মনে করা যাক এই অবস্থায় (বস্তুটি নিমজ্জনের পর) পাত্রে জলের উচ্চতা হলো H″।

∴ জলধারক পাত্রে জলের আয়তন = H″ উচ্চতায় জলধারক পাত্রে (চোঙ) জলের আয়তন

—ভাসমান পাত্রের (চোঙ) নিমজ্জিত অংশ কর্তৃক অধিকৃত স্থানের আয়তন

—নিমজ্জিত বস্তুটির আয়তন

$= \pi R^2 H'' - \pi r^2 h'' - V$

$= \pi(R^2 H'' - r^2 h'' - V.$

কিন্তু আগেই দেখান হয়েছে (2) পাত্রস্থিত জলের আয়তন $= \pi(R^2 H' - r^2 h'')$, সুতরাং অনায়াসে লেখা যায়

$\pi(R^2 H'' - r^2 h'') - V = \pi(R^2 H' - r^2 h'')$

বা, $\pi R^2(H'' - H') = V$

বা, $H'' - H' = V/\pi R^2 \ldots(4)$

(3) থেকে (4) বিয়োগ করে পাওয়া যাবে,

$H - H'' = W/\pi R^2 w - V/\pi R^2$

$= (W/w - V)/\pi R^2.$

এখন যদি বস্তুটির একক আয়তনের ওজন w′ ধরা হয়, তাহলে $W = Vw'$, সেক্ষেত্রে

$H - H'' = (Vw'/w - V)/\pi R^2$

$= V(w'/w - 1)/\pi R^2.$

যেহেতু $w' > w$ (বস্তু নিমজ্জনের শর্ত), সেহেতু $H - H'' > O$ বা $H > H''$। এছাড়া তিনটি উচ্চতা, H, H′ এবং H″-এর মধ্যে যে সম্পর্ক থাকছে, তা হলো

$H' < H'' < H.$

বলা বাহুল্য, নিবন্ধের ভূমিকায় উপস্থাপিত 'বিখ্যাত প্রশ্নটি'-র সদুত্তর H, H′ এবং H″-এর মধ্যে প্রাপ্ত সম্পর্কের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। এই সূত্রে আর একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে আলোচ্য বস্তুটির একক আয়তনের ওজন এবং জলের একক আয়তনের ওজন সমান, অর্থাৎ $w' = w$, সেক্ষেত্রে $H - H'' = O$ বা $H = H''$, এর অর্থ হলো এই বিশেষ ক্ষেত্রে জলধারক পাত্রে জলের উচ্চতার কোন তারতম্য ঘটবে না।

পরিশেষে আর একটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হবে। জলধারক পাত্রে একটি বরফখণ্ড ভাসছে। জানা আছে, বরফ জলে ভাসে এবং বরফের $\frac{1}{12}$ অংশ জলের ওপরে থাকে এবং বাকি $\frac{11}{12}$ অংশ জলের গভীরে থাকে। এই অবস্থায় পাত্রে (চোঙ) জলের উচ্চতা H এবং বরফখণ্ডটির আয়তন V হলে,

জলধারক পাত্রে জলের আয়তন = H উচ্চতায় জলধারক পাত্রে (চোঙ) সম্পূর্ণ জলের আয়তন

—বরফখণ্ডের নিমজ্জিত অংশের আয়তন

$= \pi R^2 H - \frac{11}{12} V.$

এখন বরফখণ্ডটি সম্পূর্ণ গলে গিয়ে জলে পরিণত হলে, বরফগলা জলের আয়তন হবে $\frac{11}{12}$V, কারণ 12 ঘন একক বরফ সম্পূর্ণ গলনের পর 11 ঘন একক জল সৃষ্টি করে।

∴ জলধারক পাত্রে জলের মোট আয়তন দাঁড়াবে = জলের পূর্ব আয়তন

+ বরফ থেকে প্রাপ্ত জলের আয়তন

$= (\pi R^2 H - \frac{11}{12} V) + \frac{11}{12} V.$

$= \pi R^2 H.$

এর থেকে দেখা যাচ্ছে বরফ জলে পরিণত হওয়ার পর লধারক পাত্রে জলের উচ্চতার কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যের প্রয়োজন আছে। জলের (তরলপদার্থ) আয়তন তার তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। বরফগলা জলের সংস্পর্শে এসে পাত্রস্থিত জলের তাপমাত্রার যদি পরিবর্তন ঘটে, তাহলে পাত্রস্থিত জলের আয়তনেরও পরিবর্তন ঘটবে এবং তার ফলে পাত্রে জলের উচ্চতারও তারতম্য হবে। এই জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করে আলোচ্য সমস্যায় বরফ এবং পাত্রস্থিত জল উভয়েরই তাপমাত্রা 0° সেলসিয়াস বা সেন্টিগ্রেড ধরা হয়েছে।

২৮/৪/২/১বি শ্রীমোহন লেন, কলিকাতা-২৬

মনোবিজ্ঞানে স্বপ্ন

পৃথা বল

ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন আমরা অনেকেই দেখি। কিন্তু কেন যে এমন স্বপ্ন দেখি, তা কিন্তু অনেকেই আমরা জানি না। জানতে অনেক সময় ইচ্ছাও হয় না। তাই আজ আমরা স্বপ্ন সম্পর্কে কিছু তথ্য জানবো, কেমন? এর জন্য আমাদের প্রথমেই মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে সামান্য কিছু জেনে নিতে হবে।

মনোবিজ্ঞান জ্ঞানেরই একটা অংশ মাত্র। এই বিজ্ঞান যে কি ধরনের বিজ্ঞান, কোন পর্যায়ে এর অবস্থিতি, এর ক্রিয়াকলাপ কেমন, এসব 'মনোবিজ্ঞান' বিশ্লেষণে কিছু

কিছু জানা যায়। তবে কি ধরনের বিজ্ঞান, এই মন-বিজ্ঞান? বিষয়নিষ্ঠ না আদর্শনিষ্ঠ তা কেউই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নি। একথা সাধারণভাবে বোঝা যায় মন সম্পর্কীয় বিজ্ঞানই 'মনোবিজ্ঞান'। মোটামুটি ভাবে মনোবিজ্ঞান হল জীবের আচরণ সম্বন্ধীয় এমন এক বিজ্ঞান, যা জীবের গতি, প্রকৃতি, নিয়ম, কানদ, পরিণাম নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করে, এবং মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত যে শারীরিক প্রক্রিয়া সেগুলোও বর্ণনা করে।

পুরোনো কোন ঘটনা বা অভিজ্ঞতাকে ধর তুমি, নিজের মত করে সাজিয়ে, মনের সামনে তুলে ধরলে। তখন মনোবিজ্ঞানের ভাষায় তাকে বলা হবে কল্পনা। কোন কিছু দেখবার পর তার একটা ছবি বা 'image' আমাদের মনের গভীর কোণে থেকে যায়। কল্পনার কাজ হল, সেই সব প্রতিচ্ছবি থেকে নতুন কোন গঠন-মূলক ছবি মনের সামনে তুলে ধরা। তাই ব'লে তুমি কোন কিছু ঠিক যেমনটি দেখেছো, তেমনই যদি মনে কর তবে তা কিন্তু কল্পনা হবে না। তখন তা হবে স্মৃতি।

দু'রকমভাবে আমরা এই কল্পনা করি। 'স্বাভাবিক কল্পনা,' আর বিকারগ্রস্ত কল্পনা। স্বাভাবিক ভাবে যখন আমরা কল্পনা করি, তখন সব সময় এই কথাই মনে করি, যে এই কাল্পনিক ভাবনার প্রতিচ্ছবি-গুলো আমি বা তুমি নিজের মনে মনেই সৃষ্টি করছি। আসলে কিন্তু, প্রতিচ্ছবিগুলোর বাস্তবে কোন অস্তিত্ব নেই। আবার 'বিকারগ্রস্ত' কল্পনার সময় মনের ভিতরের প্রতিচ্ছবিগুলোকে যখন দেখি, তখন বাস্তবে এটা অস্তিত্বশীল বলেই ধারণা করি। এমনই এক ধরনের বিকারগ্রস্ত কল্পনার কথা আজ তোমাদের কাছে তুলে ধরবো, যে কল্পনা আমাদের প্রত্যেকেই, কোন না কোন দিন করেছিই। যদিও এটা বিকারগ্রস্ত কল্পনা, তবুও এই কল্পনার একটা বৃহৎ প্রয়োজন আছে। এই কল্পনার নামই "স্বপ্ন"। এই স্বপ্ন আমরা প্রত্যেকেই দেখি, কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ে কেউই আমরা স্বপ্নের কারণ খুঁজে পাই না। তাছাড়া স্বপ্নে আমরা অনেক আজগুবি জিনিসও দেখি। কেন দেখি, তাও বুঝি না। কোন কোন সময়ে নিজেই বুঝে ফেলি—"কাল রাতে এই স্বপ্নটা কেন দেখলাম" যেমন মনে কর, তোমাদের মধ্যে কেউ হয়তো পরীক্ষার দু-তিন দিন আগে স্বপ্ন দেখলে, —"পরীক্ষার হলে বসে বসে পরীক্ষা দিচ্ছো"। এই স্বপ্নের কারণ কি, তা তুমি নিজেই বার করে ফেললে। "সামনে পরীক্ষা খুব চিন্তা হচ্ছিল, সেই জন্যেই বোধ হয় স্বপ্নটা দেখেছি।" সত্যিই কিন্তু তাই। চিন্তা, মনের কোন ইচ্ছা অতিরিক্ত ঘটলে, তবেই মানুষ স্বপ্ন দেখে। এ হল স্বপ্নের মানসিক কারণ। এছাড়া দৈহিক নানা কারণেও মানুষ স্বপ্ন দেখে। ঘুমের সময় শ্বাসপ্রশ্বাস,, রক্ত চলাচল প্রভৃতি দৈহিক যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটলেও আমরা স্বপ্ন দেখি।

মনোবিদ্ ফ্রয়েড বলেছেন, আমাদের মনের যে সব কামনা, বাসনা পূর্ণ হয় না, অতৃপ্তই থেকে যায়, অর্থাৎ বাস্তব জীবনে যে ইচ্ছাগুলো পরিতৃপ্ত হওয়া অসম্ভব, স্বপ্নের মাধ্যমে সেগুলো পূরণ হয়ে থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে এই ধরনের অবাস্তব ইচ্ছা বেশী রকম ভাবে জাগে, এবং এই ইচ্ছা পূরণই হতে পারে না। শিশুরা কিন্তু এই সব ইচ্ছাকে মনের নির্জ্ঞান স্তরে অবদমন করে রাখে না। কারণ তাদের মধ্যে তো কোন অপরাধ বোধ নেই। তাই তাদের যা কিছু ইচ্ছা স্বপ্নের মধ্যেই পূরণ হয়ে যায়—যেমন—"কোন ভিখিরী শিশু, এক মিষ্টির দোকানের সামনে সারা দিনরাত বসে ভিক্ষা করে। সে সারা দিনই দোকানের মিষ্টি দেখে, তার খেতে খুবই ইচ্ছা করে, কিন্তু পায় না।" কিন্তু তার এই অতৃপ্ত ইচ্ছাকে মনের নির্জ্ঞান স্তরে অবদমন করে রাখে নি। সে মাঝে মাঝেই স্বপ্ন দেখে—"মিষ্টির দোকানে ঢুকে কত রকম মিষ্টি নিজে হাতে নিয়ে খাচ্ছে।" এই ভাবে স্বপ্নের মাধ্যমে তার অতৃপ্ত ইচ্ছার প্রত্যক্ষ পরিতৃপ্তি ঘটে।

বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে এমন সব কামনা বাসনা জাগে যেগুলো হয়তো, বাস্তব সমাজে কোনদিনই পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। তখন তাকে অতৃপ্ত বাসনাগুলো অবদমন করতে বাধ্য হতে হয়। যেমন "কোন এক লোভী সন্তান, মনে মনে তার ভাইয়ের মৃত্যু কামনা করে এবং মৃত্যুর পর পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবে"। সচেতন অবস্থায় কিন্তু সে কিছুতেই এ কথা মনে স্থান দেয় না। এই ব্যক্তি একদিন স্বপ্ন দেখলো—"—তার ভাইটি মারা গিয়েছে, এবং সে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েছে।" এই যে স্বপ্নের মাধ্যমে অতৃপ্ত ইচ্ছার প্রত্যক্ষ পরিতৃপ্তি, এ কিন্তু পরিণত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সব সময় ঘটে না। ঐ ব্যক্তিই তখন অন্য ভাবে স্বপ্নটা দেখে।— "খুব পরিচিত নয়, এমন এক ধনী ব্যক্তির মৃত্যুর পাশে সে বসে আছে। মরবার আগে সেই ধনী ব্যক্তি, তার সমস্ত সম্পত্তি তাকেই উইল করে দিয়ে যাচ্ছে।" এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিটি যে তাঁর সমস্ত পিতৃ সম্পত্তির একাই অধিকারী হতে ইচ্ছুক, এটাই হল তার স্বপ্নের প্রকৃত কারণ। সাধারণভাবে স্বপ্নের অব্যক্ত রূপের মধ্যেই স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ লুকোনো থাকে।

২১/২ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭

ভালুক

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

পৃথিবীতে মাংসাশী জন্তু বেশি নেই। তার তুলনায় অনেক বেশী আছে তৃণভোজী জন্তু। ডাঙায় যে সব জন্তু থাকে, এদের মধ্যে ভাল্লুক ও উদ্‌বেরাল বংশ, আর হায়না নকুল ও কুকুর-বংশই মাংস খেয়ে বেঁচে থাকে। জলচরদের মধ্যে সীল-বংশই হল মাংসাশী।

মেরু প্রদেশের সাদা ভালুক

জন্তুদের কসের দাঁত পরীক্ষা করলে বোঝা যায় কে কি খায়। তৃণভোজীরা নিচের চোয়াল পাশের দিকে, সামনে ও পেছনে নেড়ে খাবার চিবনোর মতো চ্যাপ্টা। কিন্তু মাংসাশীরা খাবার চিবোয় না, ওপর নিচে চোয়াল নাড়িয়ে মাংস টুকরো টুকরো করে কেটে গিলে ফেলে। এজন্যে এদের কসের দাঁত কাঁচির ফলার মতো তীক্ষ্ণ। এদের অন্যান্য দাঁতও শিকার ধরা এবং মাংস ছিঁড়বার উপযোগী।

সাধারণতঃ তৃণভোজীদের শরীর মোটাসোটা হয়। এদের পাকস্থলী বড় থাকে, পেটও হয় মোটা। মাংসাশীদের চেহারা খুব মোটা হয় না। এদের ভুঁড়িও ঝুলে পড়ে না। মাংসাশীদের খুর বা শিং নেই। পায়ের গড়ন শিকার ধরার উপযোগী। আঙুলে ধারালো নখ আছে।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কোন না কোন জাতের মাংসাশী জন্তু দেখা যায়। এদের কোন কোন জাতি বেশ পোষ মানে, কিন্তু কুকুরের মতো এমন প্রভুভক্ত এইবর্গের মধ্যে আর কেউ নেই।

ভালুক দ্বি-ভোজী। এরা মাংস খায় না, এ ধারণা ভুল। ভারতবর্ষের ভালুকেরা একটু বেশি পরিমাণে তৃণভোজী। তবে সুযোগ পেলে এরা মাংস খায়।

আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া ছাড়া পৃথিবীর আর সব দেশেই ভালুক আছে। এরা মাংসাশী বর্গের, কিন্তু প্রধানতঃ নিরামিষ ভোজী। কুকুরের মতো ভালুকেরও বেয়াল্লিশটা দাঁত আছে। কিন্তু কুকুর বেড়ালের দাঁতের সঙ্গে এদের দাঁতের কিছু ফারাক আছে।

এই তিন জাতের জন্তুর ছেদন দন্ত ও শ্ব দন্ত (কুকুরে-দাঁত) একরকম হলেও চিবোয় না। টুকরো টুকরো করে কেটে গিলে ফেলে। সেইজন্য তাদের চিবনোর দাঁত কাঁচির ফলার মতো ধারালো। কিন্তু ভাল্লুক, তৃণভোজীদের মতো আশে পাশের চোয়াল নেড়ে খাবার চিবিয়ে খায়। এই জন্য এদের চিবনোর দাঁত চ্যাপ্টা।

দাঁতের গড়ন দেখলেই বোঝা যায়, ভালুকের মাংসাশী জন্তুর মতো শিকার ধরার এবং তৃণভোজীদের মতো খাবার চিবিয়ে খাবার ক্ষমতা আছে।

ভালুকের শরীর মোটাসোটা। সারা গায়ে বড় বড় লোম আছে। পায়ের পাতা খুব চওড়া। চলবার সময় এরা বেড়াল, কুকুরের মতো কেবল আঙুলের ওপর ভর দিয়ে চলে না। মানুষের মতো পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে চলে। ভালুকের প্রত্যেক পায়ে পাঁচটি করে আঙুল আর সব আঙুলে বড় বড় ধারালো বাঁকা নখ আছে। পায়ের পাতা চওড়া বলে, ভালুক পেছনের পায়ে ভর দিয়ে সোজা দাঁড়াতে পারে। এই জন্যেই ভালুক জাতীয় জন্তুদের অন্যান্য মাংসাশী বর্গের

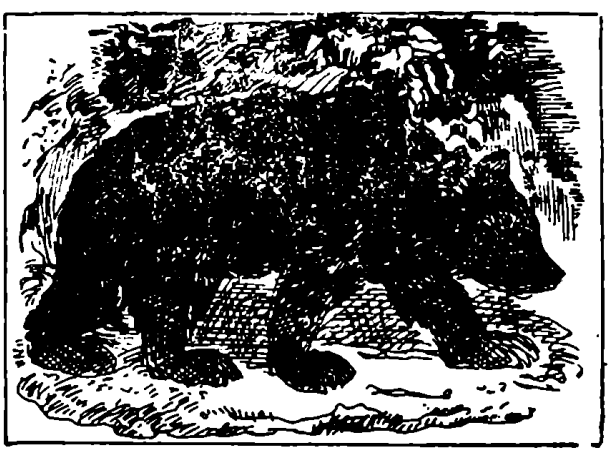

আমেরিকার কালো ভালুক

জন্তুদের থেকে বৈজ্ঞানিকরা আলাদা করেছেন এবং বর্গের একদম ওপরে রেখেছেন। এদের মুখ লম্বা, চোখ ও কান

ছোট। দর্শন আর শ্রবণ শক্তি তেমন জোরালো নয়। ঘ্রাণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ।

ফল, মূল, শস্য, নানা ধরণের পোকা-মাকড়, শামুক, ঝিনুক ভালুকের মূল খাবার। মৌচাক থেকে খুব কায়দা করে এরা মধু বের করে খায়। ফল-মূলের অভাব হলে এরা ছোট ছোট প্রাণীও বধ করে। আমেরিকার গ্রিজলি আর মেরুদেশের সাদা ভালুক বড় বড় জানোয়ার ধরে খায়।

ভালুক স্বভাবতঃ নিরীহ। রেগে গেলে খুব দুর্দান্ত হয়ে হয়ে ওঠে। তখন গাছে চড়ে তাদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। কাউকে আক্রমণ করতে হলে দুপায়ে দাঁড়িয়ে এরা দাঁত ও সামনের থাবা ব্যবহার করে।

ইউরোপ ও অন্যান্য শীত প্রধান দেশের ভালুক গোটা শীতকাল জুড়ে গাছের কোটরে বা পাহাড়ের গুহায় ঘুমোয়। শীতের শেষে ঘুম ভাঙলে খাবার খুঁজতে থাকে। গরম দেশের বড় বড় পুরুষ ভালুক কিন্তু দারুন শীতেও বনে-জঙ্গলে ঘোরে। শীতকালে মেয়ে ভালুকের বাচ্চা হয়। সাধারণত এদের দুটো ছানা হয়। জন্মের একুশ দিন পর বাচ্চা ভালুকের চোখ ফোটে। ছোটবেলায় পুষলে এরা পোষ মানে। শেখাতে পারলে নানা রকম মজার খেলা ও নাচ দেখাতে পারে।

মেটে ভালুক

ইউরোপের নানা জায়গায়, এশিয়ার হিমালয় অঞ্চলে ও তার কাছাকাছি কোন কোন জায়গায় মেটে ভালুক (Brown Bear) দেখতে পাওয়া যায়। দেশ ও জলবায়ু অনুযায়ী এদের গায়েররং ও চেহারার মাপ আলাদা আলাদা হয়।

ইউরোপের মেটে ভালুক লম্বায় প্রায় পাঁচ হাত। এশিয়ার মেটে ভালুক চার হাতের বেশি হয় না। এদের লোমের রঙও কিছু ফিকে। এই দু জাতের ভালুক আলাদা আলাদা খাবার খায়। ইউরোপের মেটে ভালুক খুব মাংসাশী। ছোট ছোট জানোয়ারে না কুলোলে এরা গরু ঘোড়ার মতো বড় জানোয়ার মেরে খায়। এশিয়ার মেটে ভালুক ফল-মূল বেশি ভালোবাসে। ফল-মূল না পেলে পোকামাকড় আর ছোট জানোয়ার ধরে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ এই ভালুককেই নাচ শেখান হয়।

কালো ভালুক

আমেরিকা, এশিয়ার হিমালয় অঞ্চল এবং মালয় উপদ্বীপে তিন রকম কালো ভালুক জন্মায়। চেহারা ও স্বভাবে এরা আলাদা।

হিমালয়ের কালো ভালুক লম্বায় সাড়ে তিন হাত থেকে চার হাতের বেশি হয় না। এদের ওপরের ঠোঁট সাদা, নাক লালচে ও নখ কালো।

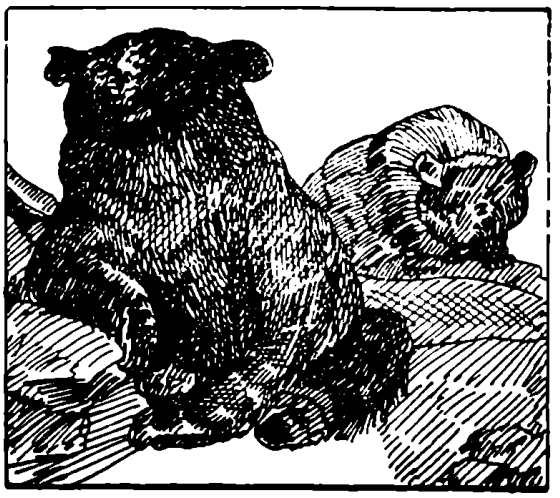

হিমালয়ের কালো ভালুক

শুধু বুকের ওপর ইংরেজী ভি-র মতো কতগুলো সাদা লোম দেখতে পাওয়া যায়। জঙ্গলের ফল, মূল ও পাতা খেতে এরা ভালবাসে। এরা সাঁতার দিতে পারে।

এই জাতের ভালুকরা একেবারে নিরামিষ ভোজী নয়। কখনও সখনও ছাগল ভেড়া হরিণ প্রভৃতি মেরে খায়। এরা ছুটে তাড়া করে।

উত্তর আমেরিকার কালো-ভালুক কিন্তু এত বড় হয় না। এদের মাথা, ছোট, মুখ সরু। সামনের পা দুটো একটু বড়। কালো ভালুকের মতো এরাও নানারকম ফলমূল, শস্য এবং হাঁস ছাগল ভেড়া ইঁদুর ব্যাং প্রভৃতি খায়। শুয়োরের মাংস এরা খুব ভালোবাসে। অনেক সময় শুয়োরের খোঁজে গেরস্ত বাড়িতে হানা দেয়। আমেরিকায় এই ভালুকের মাংস মানুষে খায় সাহেবরাও এই মাংস পছন্দ করে। শীতকালে নাকি এদের মাংস বেশি ভালো লাগে।

মালয়-উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে আর একরকম কালো ভালুক আছে। এরা আমেরিকার কালো ভালুকের থেকেও ছোট। ব্রহ্মদেশ চট্টগ্রাম ও গারো পাহাড়ে কখনও কখনও এই ভালুক দেখতে পাওয়া যায়। জঙ্গলের নানারকম ফলমূল এরা খায়। না পেলে ছোটখাটো জন্তু ধরে।

গ্রন্থকারের 'পশু-পক্ষী গ্রন্থ হইতে পুনর্লিখিত

প্রতিবন্ধীদের বান্ধব

দক্ষিণারঞ্জন বসু

নর-বানরের বন্ধুত্বের সেরা নজির রয়েছে সুপ্রাচীন রামায়ণী সাহিত্যে। সীতা উদ্ধারে রামচন্দ্রের হয়ে বানরকুলই তো সমুদ্র বক্ষে সেতুবন্ধ রচনা করেছিল ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় অভিযান পরিচালনার জন্যে। একালেও বানরকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তারা যে মানুষের অনেক সাহায্যে আসতে পারে সম্প্রতি তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বানরের খেলা দেখিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ যে জীবিকানির্বাহ করে থাকে সে তো সবারই জানা। সে সব খেলাও বানরদের শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হয়। তার জন্যেও রীতিমত ট্রেনিং দরকার। কিন্তু বানর ঠিক ঠিক ট্রেনিং পেলে মানুষের সেবায় অনেক বড়ো ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রতিবন্ধী পঙ্গুদের যে এই বানরকুল প্রকৃত বান্ধব হতে পারে, সে পরিচয় তারা রেখেছে এই চলতি প্রতিবন্ধী বর্ষে। পৃথিবীর দেশে দেশে লক্ষ লক্ষ পক্ষাঘাতগ্রস্ত নরনারী রয়েছে যাদের নানা কাজে সর্বক্ষণের সহায়ক রূপে নিয়োগ করা চলে ট্রেনিং প্রাপ্ত বানরদের।

ব্যাপক গবেষণা পরীক্ষায় দেখা গেছে, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার বন-জঙ্গলে কাপুচিন জাতীয় যে সমস্ত বানর হল্লা করে ঘুরে বেড়ায় সেগুলি শারীরিক ও দক্ষতায়, বুদ্ধি ও চাতুর্যে এবং আনুগত্য ও বিশ্বস্ততায় কুকুরের চেয়ে কম যায় না। একজন দৃষ্টিহীনের কাছে একটি কুকুরের যতটা সহায়ক হওয়া সম্ভব, কোনো পক্ষাঘাতগ্রস্ত বা পঙ্গু মানুষের পক্ষে একটি বানরও ততখানি সহায়ক তো হতে পারেই, বরং আরো বেশি কাজ বা সাহায্য আশা করা যায় ট্রেনিং-প্রাপ্ত বানরের কাছে।

এ সম্পর্কে প্রাথমিক ট্রেনিং কর্মসূচীর ফলাফল থেকে জানা গেছে যে, সিমিয়ান জাতীয় ছোট আকৃতির বানরেরা মানুষের মতোই রেফ্রিজারেটার খুলতেও পারে। টেবিলে বেশ সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখতে তারা সক্ষম। তারা দরজায় তালাবন্ধ করতে পারে এবং তালা খুলতেও পারে। মালিকের চুল আচড়ানোও তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। অন্য সব সাধারণ কাজ যে তারা হুকুম মত তালিম করবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

বোস্টনের টাফ্‌ট্‌স—নিউ ইংল্যাণ্ড মেডিক্যাল সেণ্টার হাসপাতালে এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণার এক বিস্তারিত কর্মসূচী রচিত হয়েছে। আরো বহু সংখ্যক কাপুচিন শ্রেণীর বানরকে যথাযথ ট্রেনিং দিয়ে পঙ্গু লোকদের সহকারী হিসেবে তৈরি করে দেওয়া কতটা সম্ভব এই কর্মসূচীর মাধ্যমে তা নির্ধারিত হবে এবং এই কর্মসূচী রূপায়ণের ব্যয়ভার বহন করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি প্রতিষ্ঠান—ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন এবং প্যারালাইজ্‌ড ভেটারেন্স অব আমেরিকা। এই গবেষণা কার্যের পরিচালিকা হলেন ডঃ মেরী জোয়ান উইলিয়ার্ড। এই তরুণী গবেষক মাত্র সাত বছর আগে শিক্ষাবিষয়ক মনস্তত্ত্বে বোস্টন বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট লাভ করেন।

প্রতিবন্ধীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত অসহায়। পৃথিবীর তেমনি কয়েক কোটি লোকের দুঃখ লাঘবের কথা গভীর ভাবে ভাবেন তেমন কিছু মানুষও পৃথিবীতে নিশ্চয়ই আছেন। তেমনি এক হৃদয়বতী নারী ডঃ মেরী জোয়ান উইলিয়ার্ড। বিগত বছর দশ ধরে তিনি যে ব্যাপক গবেষণা-শ্রম করে আসছেন তার মূলে রয়েছে তাঁর অসহায় মানুষদের সেবার মনোভাব। সেই মনোভাবই তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে একটি প্রশ্নে, কী করে হুইল-চেয়ারে বসে কাটানো বিকলাঙ্গ হাত-পায়ের অক্ষম মানুষগুলিকে স্থায়ী সহায়ক দিয়ে সাহায্য করা যায় এবং আনন্দ দেওয়া যায়। এ সব প্রতিবন্ধীর অক্ষমতার তীব্রতা হ্রাস করতে হলে তাদের জন্যে চাই সর্বক্ষণের সহকারী। তেমন মানুষ সহকারী নিয়োগের জন্যে প্রয়োজন বিপুল অর্থের যে আর্থিক সামর্থ্য হয়তো অনেক পরিবারেরই নেই। সে সব আর্থিক সামর্থ্যহীন পরিবারগুলির কথা ভাবতে ভারতেই ডঃ উইলিয়ার্ডের বানরকুল থেকে সহায়তা গ্রহণের কথা মনে এলো অনেক খোঁজ খবর করার পর এবং তিনি বানরদের নিয়ে এ কাজে গবেষণায় লেগে গেলেন। যারা চলচ্ছক্তি-রহিত এবং হাতের কাজ করতেও অশক্ত, সহায়কহীন অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ঘরে থাকা যে কী দুর্বিষহ ব্যাপার তাদের পক্ষে, তা উপলব্ধি করেই ডঃ উইলিয়ার্ড নানারূপ বাছবিচারের পর কাপুচিন শ্রেণীর বানরকেই প্রতিবন্ধীবান্ধব হিসেবে তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সেভাবেই তাদের ট্রেনিং দিয়ে চলেছেন। উপযুক্ত ট্রেনিং পেলে কাপুচিন বানরেরা যে মানুষ পরিচারক পরিচারিকাদের মতোই পঙ্গু বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকদের সহায়ক হতে পারে তা এখন প্রমাণিত সত্য বলে গৃহীত।

ডঃ উইলার্ডের মতে কাপুচিন বানরদের সংগ্রহ করা

এবং তাদের শিখিয়ে-পড়িয়ে পরিচারক হিসেবে তৈরি করে নেওয়া খুব একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। এ সব বানর সাড়ে তিন বছরের হলেই কর্মক্ষম বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। উচ্চতায় আঠারো ইঞ্চি পর্যন্ত কাপুচিন বানরদের বয়েস অনুযায়ী ওজন হয়ে থাকে চার থেকে বারো পাউণ্ড পর্যন্ত। সেকালের রাজরাজড়াদের ও ধনীদের কাছে এবং পর্যটকদের কাছে যুগ যুগ ধরে প্রিয় পোষা কুকুরদের মতোই আদর পেয়ে আসছে। দেখা গেছে, পোষা কুকুরের চেয়ে তিনগুণ বেশি কাল কর্মক্ষম থাকে এবং গৃহবাসী অবস্থায় ত্রিশ বছর অবধি বেঁচে থাকে।

চিকিৎসকদের দ্বারা পরীক্ষিত সুস্থ শিশু কাপুচিন প্রতিটি একশ ডলার দরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান পশুশালায় কিনতে পাওয়া যায় বলে ডঃ উইলিয়ার্ড জানিয়েছেন এবং তিনি এও জানিয়েছেন যে, একটি কাপুচিন শিশুকে ট্রেনিং দিয়ে পরিচারকের কাজে পুরোপুরি শিক্ষিত করে তুলতে দেড় হাজার ডলারের বেশি প্রয়োজন হয় না। এমনি একটি ট্রেনড্ বানরকে পঙ্গু ব্যক্তির সাহায্যের জন্যে কোনো পরিবারভুক্ত করে নেওয়া হলে তার পিছনে ঐ পরিবারের মোট খরচ হবে ছয় হাজার থেকে নয় হাজার ডলার। একটি ট্রেনড্ সহায়ক কুকুর পুষতে অন্তত আট হাজার ডলার কিন্তু তার কর্মকাল ও পরামায়ু বানরের এক তৃতীয়াংশ মাত্র। প্রতিবন্ধী-বান্ধব হিসাবে ট্রেনিং পাওয়া বানরকে পরিবার ভুক্ত করে নেওয়ার সুপারিশের এও একটা বড়ো কারণ।

কাপুচিন বানরদের প্রতিবন্ধী বা পঙ্গুদের সাহায্যের জন্যে বাড়িতে রাখার পরিকল্পনা যদি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তা হলে ডঃ মেরী জোয়ান উইলার্ড এক ব্যাপকতর কর্মসূচীর ভিত্তিতে কাজ আরম্ভ করবেন বলে ভাবছেন। কুকুরদের ট্রেনিং দেবার জন্যে আমেরিকার এবং অন্যান্য পাশ্চত্য দেশে যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় রয়েছে ডঃ উইলার্ডও তেমনি বিভিন্ন স্থানে প্রতিবন্ধী-বান্ধব তৈরির জন্যে বানরদের কতকগুলি ট্রেনিং স্কুল খুলবেন

আমেরিকায় পচাত্তর হাজার হস্তপদহীন শুধুমাত্র মাংসপিণ্ডদেহী মানুষ রয়েছে। তা ছাড়াও অবশ-মস্তিষ্ক, বদ্ধ-মাংসাপেশী প্রভৃতি নানা ধরনের হাজার হাজার পঙ্গু নরনারী রয়েছে সেদেশে যাদের মধ্যে অনেকের আবার হুইল চেয়ারে বসে কাটানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই এবং তাদের ঊর্ধ্বাঙ্গও সম্পূর্ণই নিষ্ক্রিয়।

ডঃ উইলার্ড এমনি ধরনের পঙ্গু মানুষদের সম্পর্কে বলেছেন যে, এদের সর্বক্ষণের জন্যেই একজন করে সঙ্গী সহায়ক দরকার। সব ক্ষেত্রে মানুষ সঙ্গী পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে 'পঙ্গু' নারী বা পুরুষ প্রত্যেকেই যে নিজ নিজ পছন্দ মত জীবনসঙ্গী বানর-বান্ধব পাবেন, তেমন কথা বলা যায় না বটে কিন্তু আমাদের কাজের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই ফল আমরা আশা করতে পারি যে, যে সমস্ত প্রতিবন্ধীর পক্ষে মানুষের স্থায়ী সহায়তা লাভ এবং যান্ত্রিক সাহায্য সংগ্রহ করে ওঠা সম্ভব নয় তাদের প্রকৃতি প্রয়োজন মেটাবার একটা বিকল্প ব্যবস্থা আমাদের পরিকল্পনায় পাওয়া যেতে পারে।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গুরুতর প্রতিবন্ধী অর্থাৎ সম্পূর্ণ অক্ষমদেহীদের জন্যে যদি সর্বক্ষণের সহায়ক হিসাবে ট্রেনিংপ্রাপ্ত বান্ধব তৈরি করে নেওয়া যায়, অন্যত্র তা প্রয়োজনে সম্ভব হতে পারে। বানরকুলের অভাব এশিয়ার দেশগুলিতে তো নেই-ই।

৬৪/১৩ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৩৭

শিশুবর্ষে গৃহীত পরিকল্পনায় প্রকাশিত ৬৩ ও ৬৪ গ্রন্থ

বুদ্ধদেব বসু
অপরূপ রূপকথা ১০৲

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের সন্দীপন পাঠশালা ৮৲

শৈব্যা ● প্রকাশন বিভাগ ৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৩

মাটি থেকে আকাশে

পার্থসারথি চক্রবর্তী

আকাশে উড়োজাহাজ চালানোর ইতিহাসে যাঁদের নাম চিরকাল অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁরা হলেন—দুই আমেরিকান ভাই, অরভিল আর উইলবার রাইট। বহুদিন ধরে এই দুই ভাইয়ের মনে বড় সাধ কি করে আকাশে মনের সুখে পাখীর মতো উড়ে বেড়ানো যায়!

অরভিল ও উইলবার রাইট যাঁরা নর্থ ক্যারোলিনার কিটিহকের মাঠে প্রথম এরোপ্লেন উড়িয়েছিলেন

অসীম ধৈর্য, পরিশ্রম আর অধ্যবসায় ছিল এই দুই ভাই-এর। এঁরা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে উড়োজাহাজকে আকাশে ভাসানো যত সহজ তাকে নিয়ন্ত্রণ করে তার ভারসাম্য (ব্যালান্স) বজায় রাখা তত সহজ নয়। এ ছাড়াও উড়োজাহাজকে পাইলট যাতে নিজের ইচ্ছামতো উপর দিকে উঠাতে বা নীচের দিকে নামাতে পারে তার ব্যবস্থাও বের করা। এর পরেও তাদের ভাবতে হবে উড়োজাহাজকে ডান দিকে অথবা বাঁ দিকে কাত করার কায়দা জানা।

রাইট ভাইরা দুটো ডানাওয়ালা উড়োজাহাজ তৈরী করলেন। এর একটা ডানার উপরে থাকল আর একটা ডানা। পাইলটের কাঁধের সাথে ঐ ডানা এমনভাবে বাঁধা ছিল যাতে ইচ্ছামতো দেহটাকে নাড়ালে ডানা দুটোও নড়ে ওঠে এবং তার ভারসাম্যও বজায় থাকে। অর্থাৎ অটোলিলিয়ানথেল যেমন তাঁর অঙ্গসঞ্চালনের সাহায্যে গ্লাইডারের ভারসাম্য বজায় রাখতেন, রাইট ভাইরাও অনেকটা সেই রকম ব্যবস্থাই করলেন। পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে এইলরন।

উড়োজাহাজের মুখকে উঁচু অথবা নীচু করার জন্য তার সামনের দিকে উপর-নীচ দুটো ছোট পাখা রাখার বন্দোবস্ত হ'ল। এটাই পরবর্তীকালের এলিভেটর। যদিও এটাকে তখন তাঁরা সামনের দিকে লাগালেন, পরে বিজ্ঞানীরা সুবিধার জন্য একটা পিছনের দিকে জুড়ে দিয়েছিলেন। পাইলটের কাজও ছিল ভারী মজার। সে উড়োজাহাজের সামনে বুকে ভর দিয়ে শুয়ে থাকবে আর সমস্ত উড়োজাহাজের ব্যালান্স রক্ষা করবে সামনের একটা লাঠিকে নড়াচড়া করিয়ে। এর ফলে এলিভেটরকে কণ্ট্রোল করা সহজ হোত। কাঁধের সঙ্গে উড়োজাহাজের ডানার যোগ থাকায় কাঁধটাকে নাড়ালে সেই সাথে জাহাজের ডানাটাও এদিক ওদিক নড়বে। হালের ব্যবস্থাও রাইট ভাইরা করেছিলেন। এটাই পরবর্তীকালের রাডার। ডান দিক অথবা বাঁ দিক এই রাডারের সাহায্যে সহজভাবে করা যেত। অনেক দিনের অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁরা সত্যি সত্যি তাঁদের নিজের হাতে তৈরী গ্লাইডার আকাশে ওড়ানোর কাজ সম্পূর্ণ করলেন।

আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনায় কিটিহক নামে একটা জায়গা আছে। এখানে সব সময় বাতাস খুব দ্রুতগতিতে বয়। রাইট ভাইদের এই জায়গাটা বেশ পছন্দ হোল। তাঁরা ঠিক করলেন এখান থেকেই আকাশে পাড়ি জমাবেন। ১৯০০ সালে তাঁদের গ্লাইডার তৈরী হোল। এই গ্লাইডার নিয়ে তাঁরা যে কতবার আকাশে উড়েছিলেন তা বলে শেষ করা যাবে না। এই গ্লাইডার

অর্থাৎএঞ্জিন বিহীন উড়োজাহাজই তাঁদের মনে আকাশ জয়ের তীব্র আশা এনে দিল। এঞ্জিন লাগিয়ে তাঁরা আকাশে উড়তে পারবেন এ বিষয়ে রাইট ভাইরানিশ্চিত

অবশেষে সত্যিই একদিন এঞ্জিন সমেত উড়োজাহাজ তৈরী হোল ওঁদের হাতে। প্রপেলার, এলিভেটর, রাডার—সব কিছুই ছিল এই উড়োজাহাজে। এই উড়োজাহাজের নাম দেওয়া হোল—ফ্লায়ার। ১৯০৩ খৃস্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর। রাইট ভাইরা তাঁদের তৈরী বাইপ্লেনটাকে নিয়ে এলেন নর্থ ক্যারোলিনার কিটিহকের মাঠে।

দু'ভাইয়ের মধ্যে কে প্রথম আকাশে উড়বেন? লটারী হোল। লটারীতে নাম উঠল ছোট ভাই অরভিলের। অরভিল উড়োজাহাজে উঠে স্টার্ট দিলেন। আকাশে মাত্র বারো সেকেণ্ড ছিল অরভিলের এই প্লেন। তারপর একশ কুড়ি ফুট দূরে গিয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

এর পর উইলবারের পালা। তিনি তাঁর ভাইয়ের চাইতে একটু বেশী সময় আকাশে ছিলেন। প্রায় এক মিনিট। আর পথ অতিক্রম করেছিলেন প্রায় আটশ ফুট। দর্শকদের অনেকে ভাবতেই পারে নি সত্যি সত্যি রাইট ভাইরা আকাশে উড়তে পারবেন। অনেকেই মজা দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু পরে তাঁরাও অবাক হয়ে গেলেন। খবরটাও দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল।

আগেই বলেছি রাইট ভাইদের তৈরী প্লেনটিতে দু'জোড়া ডানা ছিল। তাই একে বলা হোত বাইপ্লেন। এক জোড়া ডানাওয়ালা প্লেনকে বলা হয় মনো প্লেন। এর আবিষ্কর্তা ফরাসী বৈমানিক লুই ব্লিরিও। তিন জোড়া পাখা দিয়ে তৈরী প্লেনকে বলা হয় ট্রাইপ্লেন। এসব এখন আর চলে না। লুইব্লিরিও মনো প্লেনে চড়ে প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছিলেন

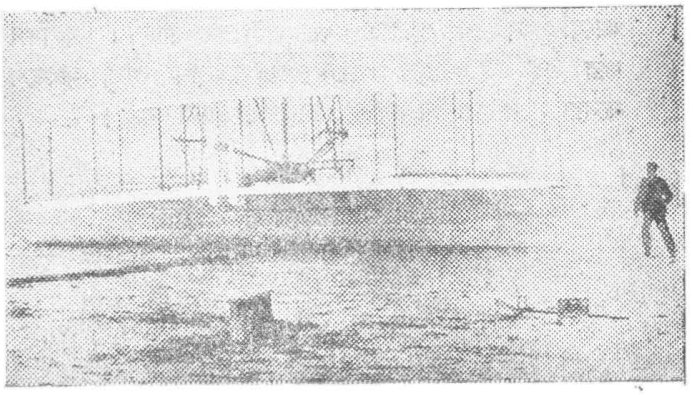

রাইট ভাইদের তৈরী প্রথম এরোপ্লেন যা আকাশে উড়েছিল

রাইট ভাইদের প্রথম আকাশে উড়ার পর থেকে কত বছর কেটে গিয়েছে! মানুষ মগজ খাটিয়ে কত সুন্দর সুন্দর প্লেন তৈরী করেছে। শব্দের চেয়েও দ্রুতগতিতে এইসব বিমান এখন ছুটে চলে।

আকাশ কেন নীল?

নিকুঞ্জবিহারী ঘোড়াই

নীল আকাশ, নীল সমুদ্র, আবার নীলরঙের বস্তু দেখলে হয়ত ভাবতে পার এদের সবায়েরই বর্ণ নীল বলেই নীল দেখায়। আবার কেউ কেউ হয়ত কৌতূহলবশতঃ লক্ষ্য করে থাকতে পার যে নীল বস্তুকে লাল আলোতে দেখলে তো আর নীল দেখায় না। এর কারণ কি?

কোন অস্বচ্ছ বস্তুর বর্ণ প্রধানত দুটি জিনিসের উপর নির্ভর করে,—বস্তুটির উপর আপতিত আলোর প্রকৃতি এবং বস্তুটি কোন্ বিশেষ বর্ণ প্রতিফলিত করতে পারে। কোন বস্তুকে লাল দেখায়—কারণ ঐ বস্তু কেবলমাত্র লালবর্ণ প্রতিফলিত করতে পারে, অন্য কোনও বর্ণ প্রতিফলিত করতে পারে না। কিন্তু নীলবর্ণের উপর লাল আলো আপতিত হলে কোনো বর্ণের প্রতিফলন না হওয়ায় বস্তুকে কালো দেখাবে। আবার অনেক রঙীনবস্তু গুঁড়া অবস্থায় সাদা দেখায়—কারণ গুঁড়া অবস্থায় এর অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা আলোকের সব বর্ণকেই প্রতিফলিত করতে পারে।

আকাশ নীল দেখায় সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। সূর্যরশ্মি পৃথিবীপৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত একই আয়তনের বিভিন্ন কণা দ্বারা বিচ্ছুরিত হয়ে আমাদের চোখে আসে। বিচ্ছুরণ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চতুর্থ-ঘাতের ব্যস্তানুপাতিক। নীল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য লাল, সবুজ বা হলদে বর্ণ অপেক্ষা কম হওয়ায় নীলবর্ণের আলোর বিচ্ছুরণ বেশী হয়। বিচ্ছুরিত আলোতে নীলবর্ণের প্রাধান্য বেশী থাকায় বায়ুমণ্ডলের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত আকাশকে নীলবর্ণে প্রতিভাত করে।

সূর্য মধ্যাকাশে থাকলে সূর্যালোক কম দূরত্বেরবায়ুস্তর অতিক্রম করে, ফলে সূর্যালোকের নীলবর্ণ খুব একটা বিচ্ছুরিত হ'তে না পারায় সূর্যকে সাদা দেখায়। কিন্তু সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় আলোকপথে বায়ুস্তরের দৈর্ঘ্য অনেক বেশী হওয়ায় ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোগুলি বিচ্ছুরিত হয়ে যাওয়ায় সূর্যকে লাল দেখায় এবং পশ্চাদ্ভাগের আকাশ নীল দেখায়।

দেউলিচক, পোঃ—ডাবুয়াপুকুর জেলা—মেদিনীপুর

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী '৮১

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতি বছরে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে সারা বিশ্বের বিজ্ঞানী মহল ও বিজ্ঞানানুরাগী মানুষেরা একটি বিশেষ ঘোষণার জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকেন। সে বিশেষ ঘোষণাটি হচ্ছে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার জয়ীদের নাম ঘোষণা। এই নোবেল পুরস্কার বিজ্ঞান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি ও সম্মান বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। তোমরা জানো নিশ্চয়, ডিনামাইট আবিষ্কারক আলফ্রেড নোবেলের সঞ্চিত প্রভূত অর্থ থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রথমে সাহিত্য, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভেষজবিদ্যা ও শান্তি এই পাঁচটি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হত। এখন অর্থনীতিতে আর একটি পুরস্কার দেওয়া হয়।

এ বছর (১৯৮১) বিজ্ঞানের তিনটি বিষয় যাঁরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁদের পরিচয় ও গবেষণার কথা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

চিকিৎসা বিজ্ঞান

এ বছর চিকিৎসা বিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্বে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তিনজন বিজ্ঞানীকে। এঁরা

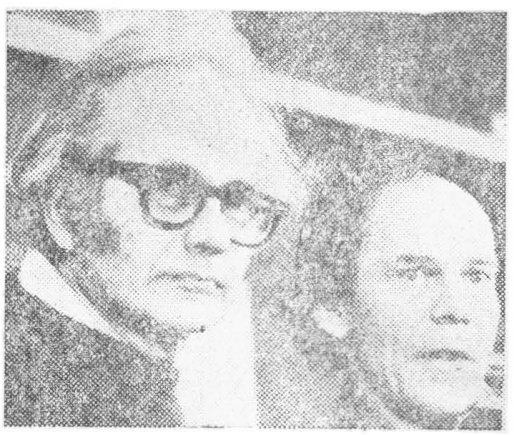

ডঃ হুবেল ও ডঃ ভিজেল

হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক রজার স্পেরী ও অধ্যাপক ডেভিড হুবেল এবং সুইডেনের অধ্যাপক টরস্টেন ভিজেল।

স্পেরী ১৯১৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্টফোর্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে মনস্তাত্ত্বিক প্রাণবিদ্যার অধ্যাপকপদে যোগদান করেন এবং বর্তমানে ঐ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। শারীরতত্ত্ব ও চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্যে অধ্যাপক স্পেরী দেশ-বিদেশের নানা সম্মাননা লাভ করেছেন। মস্তিষ্কের দুটি অংশের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এবং এই পুরস্কারের অর্ধেক পরিমাণ অর্থ তিনি পাবেন। বাকি অর্ধেক পরিমাণ অধ্যাপক হুবেল ও অধ্যাপক ভিজেলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

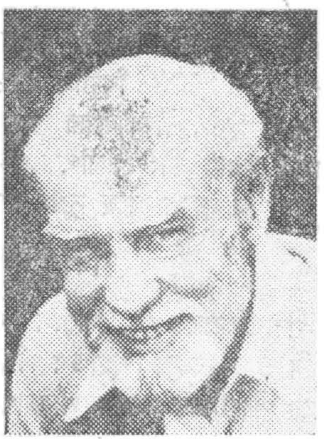

রজার স্পেরী

অধ্যাপক স্পেরী তাঁর গবেষণার মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কের উভয় অংশের কার্যকারিতার রহস্য অদ্ভুতভাবে উদ্‌ঘাটন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, উভয় অংশে বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পাদিত হয় এবং বেশির ভাগ জটিল কাজ দক্ষিণাংশে কেন্দ্রীভূত। তিনি দেখিয়েছেন মস্তিষ্কের প্রত্যেকটি অংশের অভিজ্ঞতা ও চিন্তাভাবনার নিজস্ব ধারা আছে। বাম অংশের কাজ যুক্তিনিষ্ঠ ও অনুগণকের মতো এবং ভাষা ও কল্পনাপ্রসূত চিন্তাভাবনার কাজ এই অংশে সম্পাদিত হয়ে থাকে। স্বজ্ঞা ও সৃজনী চিন্তাধারার কেন্দ্র হচ্ছে দক্ষিণ অংশ। যথাযথ চিন্তাধারা, মানসিক সচেতনতা ও জটিল সম্পর্ক উপলব্ধির দিক থেকে বাম অংশের তুলনায় দক্ষিণাংশ অধিকতর দক্ষ।

স্পেরী তাঁর গবেষণার মধ্য দিয়ে প্রায় অসাধ্য সাধনই করেছেন। মস্তিষ্কের গভীরে প্রবেশের চাবিকাঠি তিনি উদ্ভাবন করেছেন—মস্তিষ্কের যে অন্তর্লোক এতদিন আমাদের কাছে প্রায় সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত ছিল।

অধ্যাপক হুবেল ও অধ্যাপক ২০ ভিজেল বহুরেরও বেশি একসঙ্গে মস্তিষ্ক সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। চোখের মাধ্যমে মানুষ কিভাবে বহির্জগতের বার্তা গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করে তা তাঁরা উদ্‌ঘাটন করেছেন। তাঁদের গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে—একজন মানুষ কিভাবে বহির্জগৎকে দেখে সেটা নির্ভর করে তার দৃষ্টিশক্তির

প্রাথমিক অভিজ্ঞতার উপর। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, লেনসতন্ত্রে যদি কোনো ত্রুটি থাকে তা হলে মস্তিষ্ক দৃষ্টিগত ধারণাকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবে না।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন ঃ স্নায়ুতন্ত্র ও মস্তিষ্কের কার্যকারিতা আমরা যত জানতে পারব ততই মানসিক ও স্নায়ুতন্ত্রজনিত ত্রুটি বিচ্যুতি যেমন মানসিক জড় বুদ্ধি, শেখার অপটুতা, নিরাময়ের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। অধ্যাপক স্পেরী এবং অধ্যাপক হুবেল ও ভিজেলের গবেষণা সে পথই আমাদের কাছে সুগম করে দিয়েছে।

পদার্থবিদ্যা

পদার্থবিদ্যাতেও নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দুজন মার্কিন ও একজন সুইডিশ বিজ্ঞানী যৌথভাবে। এই বিষয়ে পুরস্কারের অর্ধেক পরিমাণ অর্থ পেয়েছেন সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাই সিগভান। আর

ডঃ নিকোলাস ব্লোয়েমবারগেন

ডঃ সাউলো

ডঃ রোনাল্ড হফম্যান

অর্ধেক অর্থ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকোলাস ব্লোয়েমবারগেন এবং স্টানফোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্থার সাউলো। দু ধরনের পরমাণু বর্ণালি বীক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্যে তাঁদের এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে। ব্লোয়েমবারগেন ও সাউলো উদ্ভাবন করেছেন লেসার বর্ণালি-বীক্ষণ পদ্ধতি। আর সিগবান উদ্ভাবন করেছেন উচ্চ বিশ্লেষক ইলেকট্রন বর্ণালি-বীক্ষণ পদ্ধতি। এই বিষয়ে গবেষণা করে তাঁর বাবাও ১৯২৪ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। আলোকতরঙ্গ ও বিকিরণ পরিমাপ করে পরমাণু-গঠন বিচার বিশ্লেষণের কাজে এই দুটি বর্ণালি-বীক্ষণ পদ্ধতি হচ্ছে মস্ত বড় হাতিয়ার।

পক্ষান্তরে সিগবান উদ্ভাবিত ইলেকট্রন বর্ণালি-বীক্ষণ পদ্ধতি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পরমাণু থেকে নিষ্ক্রান্ত ইলেকট্রনের বৈশিষ্ট্য জানার পক্ষে বিশেষ ভাবে সহায়তা করেছে। পরমাণু থেকে কিভাবে ও কি শক্তি মাধ্যমে ইলেকট্রন নিষ্ক্রান্ত জানতে পারলে পরমাণুর পরিবেশ সম্পর্কে অনেকখানি জানা যায়।

রসায়নশাস্ত্র

এ বছর রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দুজন বিজ্ঞানী যৌথভাবে। একজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের করনেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রোনাল্ড হফম্যান এবং অপর জন জাপানের কিয়াটো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কেনিচি ফুকুই। এই প্রথম একজন জাপানী বিজ্ঞানী রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পেলেন। অবশ্য এর আগে দুজন জাপানী বিজ্ঞানী পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

হফম্যান ও ফুকুই পৃথকভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্রমধারা সম্পর্কে তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন। তাঁদের গবেষণা নতুন ভেষজ উদ্ভাবনে, জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত বিশ্লেষণ এবং নতুন যৌগ সংশ্লেষণে তাঁদের গবেষণা বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। রাসায়নিক অণু সমূহ কেন বিশেষ বিশেষ জ্যামিতিক রূপ পরিগ্রহণ করে এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্রমধারায় কিভাবে তারা অংশ গ্রহণ করে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় হফম্যান ও ফুকুই উদ্ভাবিত তত্ত্বে। এইখানেই তাঁদের গবেষণার অসীম গুরুত্ব।

২২, টেগোর ক্যাসল স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

বিরল প্রাণী—পেঁচা

ধীরেন দত্ত

যে সমস্ত প্রাণীর মুখের সাথে মানুষের মুখের মিল আছে ছোট ছেলেমেয়েরা নাকি তাদের বেশি পছন্দ করে। তাই বোধ হয় চিঁড়িয়াখানায় পেঁচার খাঁচার কাছে ভিড় বেশি হয়।

নিশাচর পেঁচাদের নিয়ে নানা দেশে নানারকম ভীতি ও কুসংস্কার চলে আসছে। এখানে সুন্দরবনে মৌলেরা যারা বাদায় মৌমাছির চাক ভাঙতে যায়, তারা যদি ভোররাতে পেঁচার ডাক শোনে, তাহলে অলক্ষণ মনে করে সেদিনের মত বাদায় নামা বন্ধ রাখবে। চোরেরাও পেঁচাকে খুব মান্য করে চলে। মাঝরাতে মক্কেলের বাড়ী ঢোকার আগে যদি পেঁচা ডেকে ওঠে তাহলে কখনও তারা সিঁদের মধ্যে মাথা গলাবে না।

এই রকম নানাদেশে পেঁচার ডাক সম্বন্ধে নানারকম সংস্কার চলে আসছে। কুসংস্কারের কথা বাদ দিলে, পেঁচার মাংসের ঝোল খেলে নাকি হুপিং কাশি সেরে যায়, এমন ধারণা চালু আছে উত্তর-আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ানদের এক সম্প্রদায়ের মধ্যে।

সারা পৃথিবীতে প্রায় ১৩০ জাতের পেঁচা দেখা যায়। সবচেয়ে ছোট জাতের যে পিগ্‌মি পেঁচা, তারা সারা ইউরোপে, আমেরিকায় ও আফ্‌রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করে। সাড়ে ছ'ইঞ্চির মত ছোট ছোট পেঁচাগুলো গাছের কোটরে বা পাহাড়ের ফাটলে দিনের বেলা লুকিয়ে কাটায়, আর সন্ধ্যার সাথে সাথে খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।

আর একজাতের ফুটকি দেওয়া ছোট পেঁচা আছে তারাও সাড়ে ছ'ইঞ্চির মত বড় হবে। এই স্পটেড্ আউলেটরা, আফগানিস্থান থেকে আরম্ভ করে সমস্ত হিমালয়ের পাদদেশ, আসাম, মণিপুর এমনকি চীনদেশের দক্ষিণ অঞ্চল সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বাস করে। বাংলাদেশ এমনকি সুন্দরবন এলাকাতেও এদের সংখ্যা কম নয়। রাতের বেলা যে সব ছোট ছোট পোকা মাকড় চরে বেড়ায় তাদেরকেই প্রধানতঃ ধরে ধরে খায়। নেংটি ইঁদুর বা চুটকে ব্যাঙ পর্যন্ত এদের দৌড়। বড়সড় ধেড়ে ইঁদুর বা কোলা ব্যাঙ সাপটানো এদের ক্ষমতার বাইরে।

আবার প্রকাণ্ড পাখাদুটো বিস্তার করে রাতের আকাশে দাপট-চালায় ইগ্‌ল আউল। ইউরোপ আর এশিয়ার বহু ঘনাঞ্চলে এই পাখী রাতের আকাশের রাজত্ব কায়েম রাখে। এরাই সবচেয়ে বড় জাতের পেঁচা, লম্বায় সাতাশ আটাশ ইঞ্চির মত হবে, তবে পাখা দুটো বিস্তার করলে পাঁচ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। এই প্রকাণ্ড পাখীটার ভয়ে খরগোস, শূকরছানারাও সন্ত্রস্ত থাকে।

লুপ্তপ্রায় পেঁচা

আর একরকম মজার পাখী বাস করে নিউজিল্যাণ্ডে। ওদেশের লোকেরা বলে কাকাপো। দেখতে অবিকল টিয়া-পাখীর মত, সোনালী সবুজ পাখনায় সর্বাঙ্গ ঢাকা, টুকটুকে গোলাপী বাঁকানো চঞ্চু। কিন্তু স্বভাবে এরা পেঁচার দোসর। পেঁচার মতই এরা নিশাচর। দিনের বেলায় ওরা পাথরের গর্তে আত্মগোপন করে কাটায়, আর ঘনায়মান সন্ধ্যার সাথে সাথে গর্ত থেকে বেরিয়ে শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়।

নানাদেশে বিচিত্র রংয়ের সব পেঁচা দেখা যাবে। কুচ্‌-কুচে কালো যে হুতুম পেঁচা, তার হনুমানের মত গোল মুখের মধ্যে ড্যাবডেবে চোখদুটো দেখলে বাচ্চাদের ভয় পাবারই কথা। আবার সাদা পালকের ওপর গেরুয়া রংয়ের ছোপ ছোপ লক্ষ্মী পেঁচা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে।

পেঁচার কথা উঠলে ট্যাংরাখালীর সেই ঘটনাটার কথা আমার মনে পড়ে। ওখানে যে বাড়ীটায় আমি থাকতাম তার উত্তর দিকে বাড়ীঅলার একটা বোরো-ধানের ক্ষেত ছিল। ধান যেই পেকে উঠল রাজ্যের ইঁদুর কোথা থেকে যে এসে

জুটলো। রাতে তারা দলে দলে ধানক্ষেতে হামলা করত।

বারান্দায় বসে বসে দেখতাম, সন্ধ্যার একটু পরেই প্রকাণ্ড একটা কালো পেঁচা পাঁচিলের ওপর এসে বসতো আর ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখতো। সুযোগ বুঝে ঝপ্ করে পড়তো ক্ষেতের মধ্যে, খানিকক্ষণ তড়বড় করতো তারপর মরা ইঁদুরটাকে নিয়ে গিয়ে বসতো বাবলা গাছের ডালে। আবার দেখি খানিকবাদে এসে বসেছে পাঁচিলের ও-কোণে। প্রতি রাত্রে ও দু-তিনটে ইঁদুরকে পাকড়াও করবেই। যতবার ও ইঁদুরের ওপর ঝাপ দিয়েছে প্রতিবারই একটা একটা ইঁদুর মুখে নিয়ে ও উঠে এসেছে। কখনও ওকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেখিনি।

এমনি এক চাঁদনী রাতে বারান্দায় বসে আছি। পেঁচাটা পাঁচিলের ওপর এসে বসল, এদিক ওদিক ফালুক ফুলুক করে দেখছে, একসময় ঝপ্ করে পড়ল ক্ষেতের মধ্যে। ঝট্‌পট্ আওয়াজ আসছে, শুকনো খড়ের মধ্যে হুটোপুটি হচ্ছে, বড় বড় ধেড়ে ইঁদুরদের সাপটানো সহজ কি! বেশ খানিকক্ষণ খড়বড় শব্দ হল, তারপর সব ঠাণ্ডা। পেঁচাটাতো মরা ইঁদুরটাকে নিয়ে উঠে এল না!

দারুণ উদ্বেগ নিয়ে আমি ঘটনাস্থানে ছুটে গেলাম। দেখলাম পেঁচাটা মরে পড়ে আছে, তখনও তার শরীরটা থর্‌থর্ করে কাঁপছে। পাখনা ধরে তুললাম, সাথে সাথে উঠে এল মরা ইঁদুরটাও। ধেড়েটার পিঠের মাংসে চেপে বসেছে পেঁচার তীক্ষ্ণ নখগুলো, আর ইঁদুরটা উল্টে এসে পেঁচার গলায় এমন কামড় বসিয়েছে যে নলীটা একেবারে দু-ফাঁক।

পৃথিবীর সর্বত্রই পেঁচা দেখা যায়। উত্তর মেরু প্রদেশে যেখানে সারা বছর বরফে ঢাকা সেখানকার পাতা-ঝরা গাছের জঙ্গলে তুষার পেঁচাদের বাস। এখানে আবার বছরে ছ'মাস রাত তাই দিন রাতের তোয়াক্কা না করে সব সময়ই শিকার ধরে।

এমনিতে পেঁচাদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে মূষিক জাতীয় প্রাণী, তবে এরা ব্যাঙ, প্রভৃতিও ধরে ধরে খায়, মেছো-পেঁচারা ঘুরঘুট্টি অন্ধকারেও জলাশয় থেকে ছোঁ মেরে মেরে মাছ ধরতে ওস্তাদ। বড় বড় পেঁচারা খরগোপ এমনকি ছোটখাটো ভেড়ার বাচ্চাকেও সাপটাতে পারে। কানাডার তুষার পেঁচারা উড়ন্ত রাজহাঁসকে কাবু করে প্রায়ই। এ ছাড়া নিশাচর যে সমস্ত পোকা মাকড় যারা ধান, গম, ফলপাকড়ের শত্রু তাদের খেয়েই পেঁচারা প্রধানতঃ জীবন-ধারণ করে, আর, সেই জন্যেই পেঁচাদের মানুষের পরম বন্ধু বলে মনে করা উচিৎ। যখন ওরা কোনো কিছুই পায় না তখন অন্য পাখীদের বাসায় হামলা চালায়। তাই সব পাখীরা পেঁচাদের দু'চক্ষে দেখতে পারে না।

রাতের অন্ধকারে ওদের দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়ে ওঠে, তার সাথে যোগ হয়েছে ওদের অতি তীক্ষ্ণ শ্রবণ ক্ষমতা, তাই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে শিকারের আনাগোনা ওরা বুঝতে পারে।

নানা দেশে নানা কায়দায় পেঁচারা তাঁদের বাসা বানায়। দিনের আলো সহ্য করতে পারে না বলে পেঁচারা নির্জন অন্ধকার কোটরে বা পাহাড়ের ফাটলে দিনের বেলা আত্মগোপন করে কাটায়। উত্তর আমেরিকার এলফ-পেঁচারা ক্যাকটাস গাছের গুড়িতে ফোকর করে বাসা বাঁধে, মধ্য আমেরিকায় এক জাতের পেঁচা আছে যারা বন্যজন্তুর পরিত্যক্ত গর্তে বাসা বাঁধে, আফরিকার ঘেসো-পেঁচারা লম্বা লম্বা ঘাসবনে বাসা করে দিনের বেলা লুকিয়ে কাটায়। আমাদের এখানে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের রামপুরা বাংলোয় চার জোড়া হুতুম-পেঁচা নিশ্চিন্তে বাস করছে।

অন্য পাখীদের থেকে এরা ডিম পাড়ে একটু বেশি বয়েসে। সাধারণতঃ তিন-চারটে গোল গোল, হলদেটে ডিম পাড়ে মাদিটা আর পঁয়ত্রিশ দিনে ডিম ফুটে ছানা বের হয়। সব পাখীরা ডিম থেকে বের হবার সাথে সাথে চোখ মেলে দেখতে পায়, কিন্তু পেঁচার বেলায় অন্য ব্যবস্থা। ডিম থেকে বের হবার পর পেঁচার ছানাদের চোখ ফোটে না, ন'দিন পরে ওদের চোখ খুলবে আর ড্যাবডেবে চোখে দুনিয়াটাকে দেখে নেবে।

কিন্তু পৃথিবীর সবদেশেই পেঁচার সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। প্রধানতঃ বড় বড় গাছের কোটরে পেঁচাদের বাস। করাত কলের কল্যাণে বড় বড় গাছ আজকাল আর থাকছে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নির্জন পরিত্যক্ত স্থানও আর বিশেষ নেই। নির্জনে বসার জন্য এতটুকু স্থান ওরা আর খুঁজে পাচ্ছে না।

তাছাড়া এদের সংখ্যা দ্রুত কমে যাওয়ার আর একটা প্রধান কারণ হচ্ছে ব্যাপক কীট-নাশক ওষুধের ব্যবহার। কীট-নাশক ওষুধে জর্জরিত হয় কিছু কিছু পোকামাকড়, সেই সব পোকা মাকড় ভক্ষণ করলে মাদি পেঁচাদের প্রজনন যন্ত্রে বিষক্রিয়া হয়। এই সব মাদি-পেঁচারা যে সমস্ত ডিম পাড়বে তার খোলা শক্ত হয় না। নরম তুলতুলে ডিম ফুটে ছানা হয় না। এইভাবে নিশ্চিত ভাবে পেঁচাদের বংশ বৃদ্ধি কমে যাচ্ছে এবং ধীরে অথচ নিশ্চিত ভাবে এরা অবলুপ্তির পথে চলেছে।

সন্দেশখালি, ২৪ পরগনা

অজানা মহাকাশে

১৪

(ক্রমশঃ)

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদ অনুমোদিত পাঠক্রম অনুসারে
একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য প্রকাশিত পুস্তকসমূহ

অধ্যাপক আনন্দমোহন ঘোষ
অধ্যাপক কেশব বসুর সহযোগিতায়
শ্রীকেশবচন্দ্র নাগ প্রণীত
হায়ার সেকেণ্ডারী
★ ম্যাথামেটিক্স (প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র)
(বাংলা ও ইংরাজী সংস্করণ)

PROF. JANA & MITRA
H. S. Objective Mathematics

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
★ রসায়ন বিজ্ঞান (প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র)
ব্যবহারিক রসায়ন

অধ্যাপক হরশঙ্কর ভট্টাচার্য
★ উচ্চ মাধ্যমিক ধনবিজ্ঞান
প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

★ An Introduction to
ECONOMICS

অধ্যাপক হরশঙ্কর ভট্টাচার্য
অধ্যাপক উৎপল দত্ত
★ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান
প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র
(বাংলা ও ইংরাজী সংস্করণ)

★ জন প্রশাসন বিজ্ঞান
প্রমথ ও দ্বিতীয় পত্র

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত
★ দেবী চৌধুরাণী-উপপাঠ্য
(মূলগ্রন্থ, টীকা সম্বলিত)

ডঃ গোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরী
অধ্যাপক কৌশাম্বীনাথ মল্লিক
★ উচ্চ মাধ্যমিক ইতিহাস
প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র
(আধুনিক ভারত, ইউরোপ ও পৃথিবী)

অধ্যক্ষ কুমারেশ বসু
অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
★ অর্থনৈতিক ভূগোল
প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

অধ্যাপক অনিল বসু
★ ব্যবসায় সংগঠন
প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

অধ্যাপক বসু ও ডক্টর বসু
★ হিসাব শাস্ত্র (প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র)

অধ্যাপিকা ডঃ নারায়ণী বসু
★ গৃহ পরিচালনা
ও গৃহ শুশ্রূষা
প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

★ খাদ্য ও পুষ্টি
প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

অনিমেষ কান্তি পাল
★ বাঙ্গালা দ্বিতীয় পত্র
(ব্যাকরণ, অনুবাদ, রচনা, সারাংশ, ও পত্রলিখন)

অধ্যাপক শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়
★ দর্শন প্রবেশিকা
প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

CALCUTTA BOOK HOUSE, 1/1A, Bankim Chatterjee St. Cal.-700073

নমুনা পুস্তকের জন্য যোগাযোগ করুন Phone-34-5376

ছোটদের দপ্তর

● তোমরা যারা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়মিত পাঠক এবং স্কুলে পড়াশোনা করছ—'ছোটদের দপ্তরে' লেখা পাঠাতে পার। সম্পাদকমণ্ডলীর মনোনয়ন পেলে সে লেখা 'ছোটদের দপ্তরে' ছাপা হবে। তবে শব্দ-সংখ্যা কিছুতেই যেন ২০০-এর বেশী না হয়। সংগে প্রয়োজন মতো ফটো বা আঁকা ছবি পাঠাবে।

● শুধু আমাদের প্রশ্নই নয়, তোমরাও ছোটদের দপ্তরে প্রশ্ন পাঠাতে পার। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রশ্ন, পড়াশোনার প্রশ্ন, যার উত্তর আমরা পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে প্রকাশ করব।

তবে সব ক্ষেত্রেই চিঠি বা খামের উপরে 'ছোটদের দপ্তর' কথাটি উল্লেখ করতে হবে।

জয়ন্ত দত্ত, পরিচালক, ছোটদের দপ্তর,

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার গত সংখ্যার সমাধান তোমরা মাত্র দুজন ছাড়া কেউই সবকটি সঠিক করতে পারনি। তবে, যারা দশটি বা তার বেশী প্রশ্নের উত্তর সঠিক পাঠাতে পেরেছো তাদের নাম ছাপা হলো।

যাদের সবকটি প্রশ্নের উত্তর ঠিক হয়েছে ঃ

১। উৎপল মজুমদার—কলকাতা
২। অভিজিৎ দত্ত—হুগলী

যাদের দশ বা তার বেশী প্রশ্নের উত্তর ঠিক হয়েছে ঃ

১। সুব্রত চট্টোপাধ্যায়—পুরুলিয়া
২। অর্পিত কুমার মিত্র—হাওড়া
৩। নিলয় দত্ত—পুরুলিয়া
৪। আশিস চ্যাটার্জী—চুঁচড়ো
৫। পল্লব মোহান্ত—নদীয়া
৬। অতনু চ্যাটার্জী—কলকাতা
৭। রবিন পাল—কলকাতা
৮। শান্তনু ঘোষ—হাওড়া
৯। সন্দীপ পাল—হুগলী
১০। স্বাতী ব্যানার্জী—কলকাতা
১১। সুতপা রক্ষিত—কলকাতা
১২। দীপ চ্যাটার্জী—হাওড়া
১৩। সমীরণ বিশ্বাস—কলকাতা
১৭। আশিস রায়—শিবপুর
১৫। অমিতাভ চ্যাটার্জী—চন্দননগর
১৬। বিপ্লব বিশ্বাস—কলকাতা
১৭। সুকান্ত ঘোষ—নিউ ব্যারাকপুর
১৮। অর্ঘ সরকার—দুর্গাপুর
১৯। সুমিতা চৌধুরী—নব ব্যারাকপুর

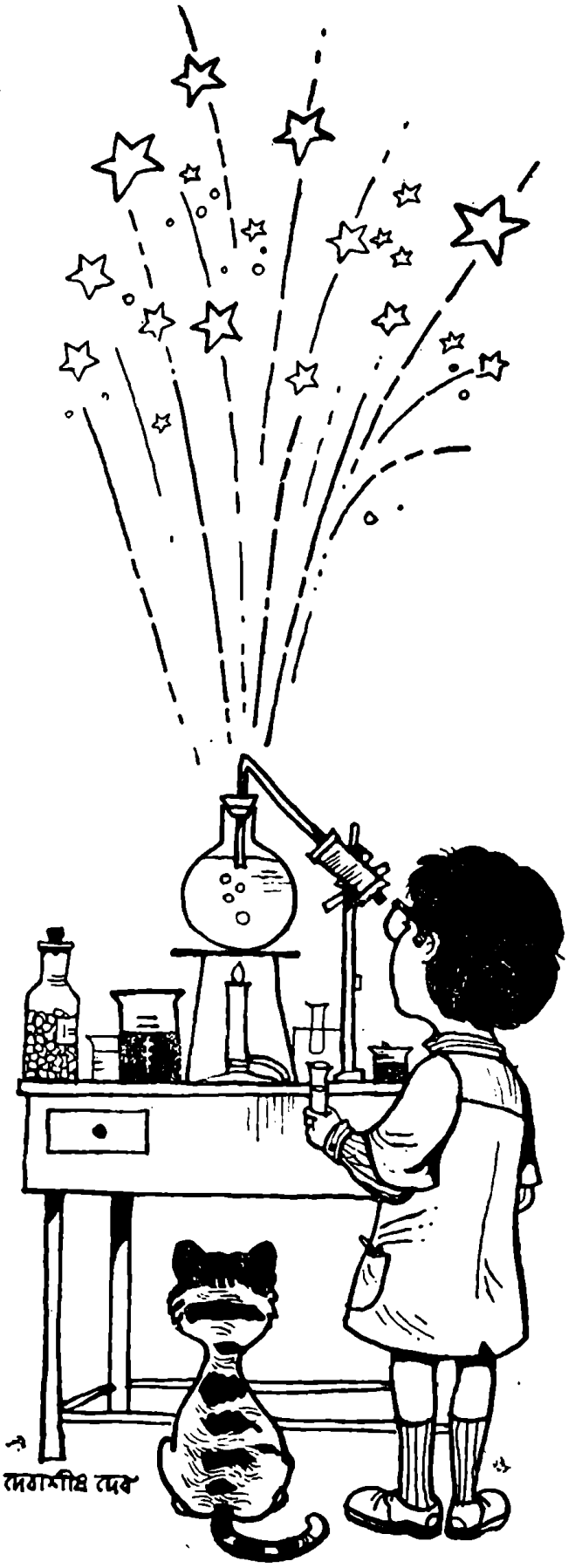

দেবাশীষ দেব

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা শ্রীবৈজ্ঞানিক

১। 'স্টেপ্টোমাইসিন'-এর আবিষ্কর্তার নাম কি ?
২। কোন্ মৌলের প্রতীক Rh ?
৩। 'স্যাকারিন'-এর উৎস কি ?
৪। পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের প্রস্তরময় স্তরের নাম কি ?
৫। 'লিটমাস' জিনিসটা কি ?
৬। কেন্নো, বিছা প্রভৃতি যে-সব প্রাণীর অসংখ্য পা আছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঐ সব পায়ের সাহায্যে যারা বুকে হেঁটে চলে, জীব-বিজ্ঞানের ভাষায় তাদের কি বলা হয় ?
৭। অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহারে চোখের কি রকম দৃষ্টি দোষ সংশোধিত হয় ?
৮। 'মাইক্রো' কথাটির অর্থ কি ?
৯। 'ভিটামিন-সি'-এর অভাবে মানুষের কোন রোগ হয় ?
১০। কাঁসা বা বেল-মেটাল জিনিসটা কি ?
১১। 'ফার্ন' জিনিসটা কি ?
১২। বিভিন্ন আলোক-রশ্মির উজ্জ্বল্য তুলনামূলক ভাবে স্থির করবার জন্যে কোন্ যন্ত্র ব্যবহৃত হয় ?
১৩। মাদাম ক্যুরী 'রেডিয়াম' আবিষ্কার করেছিলেন কোন্ খনিজ পদার্থ থেকে ?
১৪। সম্ভ্রান্ত ধাতু বা 'নোবেল মেটাল' কোন্গুলি ?
১৫। কোন্ ধাতুর অক্সাইড 'গ্যাস ম্যাণ্টেল' তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় ?

সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রথম দশজনের নাম পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

(সমাধান ঃ পরবর্তী সংখ্যায়)

ভেবে ভেবে বল'র উত্তর ঃ

১) চারটেই ফল। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যার মধ্যে বীজ আছে সেটা ফল। যার বীজ নেই সেটা সবজি।

২) LATEX

৩) বরফের কিস্ট্যাল [কেলাস]

৪) ভিটামিন 'ডি' (D)।

৫) WOMBAT

৬) পায়ের খাঁজে ডানার নীচে।

৭) এককোষী উদ্ভিদ্ (One cell plant)

ভেবে ভেবে বলো

শুভব্রত রায়চৌধুরী

১) বরবটি, ঢেঁড়শ, টোম্যাটো এবং শশা এদের মধ্যে কোনটি ফল এবং কোনটি সবজি বলতে পারে ?

২) রবার এক প্রকার গাছের ডাল থেকে নির্গত তরল পদার্থ থেকে তৈরী হয়। এই তরল পদার্থের নাম কি ?

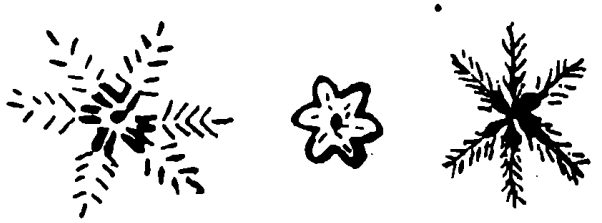

৩) উপরের ছবিতে তিনটি নক্সার মতো দেখা যাচ্ছে এগুলো কি ?

৪) সূর্য কিরণ আমাদের শরীরে কি ভিটামিন যোগায় ?

৫) নীচের যে জন্তুটিকে দেখা যাচ্ছে তার নাম বলো।

৬) গঙ্গাফড়িং এর কান কোথায় থাকে ?

৭) নীচের ছবিটি কি বলতে পার ?

প্রশ্নোত্তর

মানস রায়চৌধুরী, শিবপুর, হাওড়া

প্র ঃ নাগরদোলায় চড়ে ওপরে উঠলে নিজেকে ভারী মনে হয়, এবং ঘুরে নিচে নেমে এলে নিজেকে হাল্কা মনে হয়। কেন ?

উ ঃ ওজন বাড়ছে বা কমছে মনে হওয়া একটা অনুভূতির ব্যাপার। পতনশীল অবস্থায় একটা ভারহীন অনুভূতি হয়। ওজন তখনই অনুভব করা যায় যখন বাধাপ্রাপ্ত হতে হয়। নাগরদোলায় নামার সময় আংশিকভাবে এই বাধা কাজ করে না। ফলে ওজন কমার অনুভূতি হয়। ওপরে ওঠার সময় নাগরদোলা যাত্রীর ওপর যে শক্তি প্রয়োগ করে তার বিপরীত ক্রিয়া যাত্রীকে বাধা দেয়মনে হয় ওজন বেড়ে গেছে।

দেবাশিস পাঠক, পাঁশকুড়া

প্রশ্ন (ক) চলতে চলতে আমরা সূর্য কিংবা চন্দ্রের দিকে তাকালে সূর্য কিংবা চন্দ্রকে আমাদের সঙ্গে চলতে দেখি কেন ? (খ) বেতার কেন্দ্র থেকে আমাদের বাড়ী একশ কি. মি. দূরে। বেতার কেন্দ্রে যখন সময় বলে তখন আমরা সেই সময়ের সঙ্গে আমাদের ঘড়ি মেলালে ঘড়ি কি স্লো হয়।

উঃ—(ক) চলমান অবস্থায় দর্শকের অবস্থান পালটায়, সে যা দেখে তারও আপেক্ষিক অবস্থান পালটায়। তাই মনে হয় চাঁদও তোমার সঙ্গে চলেছে।

(খ) না। ঘড়ি স্লো যাবে না। কারণ, বেতার তরঙ্গে গতি আলোর গতির মত। সেকেণ্ডে ৩,০০,০০ কি. মি. (প্রায়)। অতএব বুঝতেই পারছি একশ' মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে তার সময় লাগে না বললেই চলে। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে-মুহূর্তে বেতারকেন্দ্র থেকে সময় সংকেত পাঠান হবে, তুমিও তা শুনবে সেই মুহূর্তেই।

শ্রীঅতনু ভট্টাচার্য, হুগলী

প্র ঃ বাষ্প (Vapour) কি ? বাষ্প কি আমরা চোখে দেখতে পাই ? যদি দেখতে পাই তবে আমরা আমাদের চারিদিকে শূণ্যস্থানে তা দেখতে পাই না কেন ? আর যদি না দেখতে পাই তবে কোনো পাত্রে জল ফুটতে থাকলে যে ধোঁয়া নির্গত হয় সেটা কি ?

উত্তর ঃ বাষ্প হলো তরল পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থা। যখন বাষ্প খুব ঘন অবস্থায় থাকে, তখন আমরা তা দেখতে পাই।

কোন পাত্রে জল ফুটলে যে ধোঁয়া বেরোয় সেটা জলীয় বাষ্প।

দীপঙ্কর গুহ, চকবাজার

প্র ঃ আমার বাড়ীর কাছে একটি দোকানদার, এক-দিন আমায় বলেন যে, আমার বাড়ীতে যদি টর্চের পরিত্যক্ত ব্যাটারি থাকে তবে তাঁকে দিতে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, তাঁর ছোট পকেট রেডিওটি চালু করবেন। আমি তাঁকে ছোট পেন্সিল টর্চের ৪টি ও বড় টর্চের ৪টি ব্যাটারি দিলাম। পরে আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে, তিনি তাঁর পকেট রেডিওতে সেই ব্যাটারি ভরে দিলে বেশ জোরে অনুষ্ঠান শোনা গেল। এই ঘটনা কি করে সম্ভব ? উঃ—চারটে নতুন ব্যাটারি একটা চার-ব্যাটারির টর্চে ভরে নাগাড়ে ছ' ঘণ্টা জ্বেলে রাখলে দেখা যাবে টর্চের আলোর জোর ক্রমেই কমে আসছে। কিন্তু চারটে নতুন ব্যাটারি লাগিয়ে একটা ট্রানজিস্টার রেডিও এক নাগাড়ে ছ' ঘণ্টা কেন বারো ঘণ্টা বাজালেও ব্যাটারির জোর কমে না। এর কারণ টর্চের বাল্ব জ্বালতে হলে ব্যাটারি থেকে যে বিদ্যুৎ (Current) টেনে নিতে হয়, ট্রান্‌জিস্টার রেডিও চালাতে তত বিদ্যুৎ লাগে না। এই কারণেই যে-ব্যাটারি টর্চের কাজে লাগছেনা সেটা কিন্তু অল্প কিছুদিনের জন্যে হলেও ট্রানজিস্টার রেডিও চালানোর কাজে সম্ভব।

আশীষ চ্যাটার্জী, চুঁচড়ো হুগলী

প্র ঃ হিণ্ডালিয়াম, ঝালাই ধাতু, স্টেনলেস স্টীল প্রভৃতি সংকর ধাতুগুলি কোন কোন উপাদানে তৈরি ?

হিণ্ডালিয়াম ঃ উ ঃ—হিণ্ডালিয়াম কোন সংকর ধাতু নয় একটি কম্পানির 'ট্রেড্ নেম্' যারা প্রধানতঃ খাবার বাসন তৈরি করে। তবে অ্যালুমিনিয়ামের যে সংকর ধাতু থেকে রান্নার বা খাবার বাসনপত্র তৈরি হয় তাতে থাকে ১১% তামা ও বাকীটা অ্যালুমিনিয়াম। তবে ঢালাই করা সংকর অ্যালুমিনিয়ামের বাসনে থাকে ৪% ম্যাগ্‌নেসিয়াম ও বাকীটা অ্যালুমিনিয়াম।

ঝালাই ধাতু ঃ ঝালাই 'দু' রকমের হতে পারে। নিম্ন-তাপে ঝালাই যাকে Soft solder বলে আর উচ্চ তাপে ঝালাই যাকে brazing বলে।

Soft solder দস্তা ও টিনের ধাতু সংকর যাতে ২১% থেকে ৬৩% টিন থাকে আর বাকীটা দস্তা।

Brazing Solder মূলতঃ তামা ও দস্তার ধাতু সংকর যাতে ৫০% থেকে ৫৫% তামা থাকে বাকীটা দস্তা। তবে ১৬-৫২% তামা, ৪-৩৮% দস্তা ও ১০-৪০% রূপাও থাকতে পারে। কাজ অনুসারে কখনো নিকেল রূপার সংকর ধাতুও ব্যবহার করা হয়।

স্টেন্‌লিস্ স্টীলঃ স্টীলের সঙ্গে ১০% এর বেশি ক্রোমিয়াম মিশিয়ে স্টেন্‌লেস স্টীল তৈরি হয়।

রোবটের হল মৃত্যু

শান্তনু নায়েক

"মঙ্গলের একটা অভিজাত পাড়ায় দুই বিঘে জমি বিক্রী হবে"—বিজ্ঞাপনটা পড়েই ভেতরে ছুটলাম খবরটা দেবার জন্যে। খবরটা শুনেই রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন শ্যামল-দা, 'বলিস কি রে শুভু! যে করেই হোক কিনতে হবে জমিটা।'

দিদির স্বভাবই হচ্ছে শ্যামল-দার প্রত্যেকটা কাজের বিরোধিতা করা, 'কি হবে ঐ পচা মঙ্গলে জমি কিনে? বেশ তো আছি এখানে!' এবারও তাই ব্যতিক্রম হল না তার।

'তুমি বলছো কি? অত সুন্দর একটা জমি ছেড়ে দোব? আর পাড়াটাও যত এমিনেন্ট লোকের আস্তানা। আমাকে চেষ্টা করতেই হবে জমিটা কিনতে। আর এখানে ভালো থাকার কথা বলছো? তোমার বাবা, স্বর্গতঃ প্রফুল্লবাবু সবজির ক্ষেতই যদি টিকিয়ে রাখতে না পারতেন, তাহলে কি হত বল তো? তোমার মেন আপত্তি তো ঐ কেমিক্যাল খাবার! তা যস্মিন্ অবস্থায় যথাচার। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা উচিত। এটা তো আর বিংশ শতাব্দী নয় যে যত খুশী সবজিয় চাষ করবে আর খাবে! সবজির ক্ষেত তোমাকে ছাড়তে হবেই। শ্বশুরমশায় বেঁচে ছিলেন যদ্দিন, ততদিন এদিকে শ্যেনদৃষ্টি ফেলার সাহস হয় নি কারো। এখন তো আর তিনি নেই। কাজেই হাজার হাজার লোক যেখানে থাকবার জায়গাই পাচ্ছেন না, সেখানে এত বড় একটা ক্ষেত দখল করে রাখাটা সম্ভব নয় বেশীদিন। সুতরাং কেমিক্যাল খাবার ছাড়া গতি নেই এ যুগে। আচ্ছা চলো, মায়ের মতটা জেনে আসা যাক।'

প্রস্তাবটা শুনেই মা বললেন, 'এতে জিজ্ঞেস করবার কি আছে? মিলি যা বলে বলুক, তুমি চেষ্টা করতে কসুর করো না, শ্যামল। তাছাড়া পাড়াটায় একটা ভালো ইস্কুলও হয়েছে' শুনেছি। শুভাশীষের পড়াশোনার ক্ষতিও হবে না কিছু।'

শ্যামল-দার অসাধারণ মনোবলের পরিচয় এর আগেও পেয়েছিলাম, আবার একবার পেলাম। মাত্র মাস ছয়েকের মধ্যেই জমি-টমি কিনে দোতলা একটা বাড়ী তুলে ফেললেন রীতিমত। টেলিভিশন ও কম্পিউটারের মাধ্যমে পৃথিবীতে বসেই বাড়ী তৈরীর কাজ চালিয়েছিলেন ইঞ্জিনীয়ার শ্যামল-দা, মাঝে একবার মাত্র যেতে হয়েছিল আমাদের। শ্যামল-দা আমাকে নিয়েই গিয়েছিলেন মিস্ত্রী ঠিক করবার জন্যে। ওখানকার বিখ্যাত এক রাজমিস্ত্রীকেই নিযুক্ত করা হল। মজুর হিসাবে কাজ করেছিল কয়েকটন ওজনের চার-চরটে রোবট। কাজেই বাড়ী উঠতে দেরী হয় নি খুব বেশী।

সেবারেই আমাকে ওখানকার স্কুলে ভর্তির সমস্ত ব্যবস্থা করলেন শ্যামল-দা। পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যে দু'খানা স্পেসশিপ খেয়া দেয় প্রতিমাসে দু'বার করে। তারই একটায় চড়ে ৭ই ফেব্রুয়ারী আমরা রওনা হয়ে পড়লাম মঙ্গলের উদ্দেশ্যে। টেলিভিশনের পর্দায় দেখে আমাদের বাড়ীটার সম্বন্ধে যে ধারণা হয়েছিল, এখানে এসে দেখলাম —তার থেকে অনেক অনেক সুন্দর হয়েছে বাড়ীটা। শ্যামল-দার অত্যাধুনিক প্ল্যানে তৈরী বাড়ীটা আমার এত পছন্দ হয়ে গেল যে ঘরে ঢুকেই আমি ঘোষণা করলাম, 'দোতলার হ্রদের দিকের ঘরটা আমি নোব, বলে রাখছি।'

সঙ্গে সঙ্গে দিদি বলে উঠলো, 'কখনো না। ওটা আমার। তুই ওর পাশেরটা নিবি। পাশেরটা থেকেও তো হ্রদ দেখা যায়।'

আমি এবার রীতিমত চ্যাঁচামেচি শুরু করলাম, 'তুই-ই পাশেরটা নে না কেন। আমি প্রথমে বলেছি, কাজেই ঘরটা আমার।'

শ্যামল-দা আমাদের ঝগড়া মিটিয়ে দেবার জন্যে বললেন, 'চলো আমরা মিঃ রোবুকে মধ্যস্থ মানি। ও যাকে দিতে চাইবে, ঘরটা তারই।'

রোবু হল একটা রোবট। আমরা যখন এখানে আসি নি, তখন ও ছিল আমাদের বাড়ীর কেয়ার-টেকার। শ্যামল-দা ওকে কিনে নিয়েছেন রাজমিস্ত্রীর কাছ থেকে, অবশ্যই বেশী দামে।

মিঃ রোবুকে হাত করে নেবার জন্যে আমি তৎক্ষণাৎ ছুটলাম ওর ঘরের দিকে। চেয়ারে বসে ও তখন এক মনে সিগারেট খাবার ভান করছিল। আমাকে দেখেই লজ্জিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'থ্যাংক্স।'

আমি ওর সাথে শেকহ্যাণ্ড করে বললাম: মিঃ রোবু, তোমায়, আমি এবং আমার দিদি মধ্যস্থ স্থির করেছি। দো-তলার হ্রদের দিকের ঘরটা তুমি যাকে দিতে চাইবে সেই পাবে। আমাকে যদি দিতে চাও, তাহলে তোমায় ক্যাড্‌বেরী খাওয়াবো আমি।'

ইতিমধ্যে দিদিরা চলে এসেছিল। শ্যামল-দা বললেন, 'কাকে দিতে চাও ঘরটা তুমি রোবু?'

রোবু একবার দিদিকে দেখে নিল। তারপর আমার দিকে ঘুরে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ওকে দিতে চাই না। কারণ ও আমায় ঘুঁষ দিতে চেয়েছিল!'

দিদি সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলো, 'দেখছো মা, রোবু আমাদের কত আইডিয়াল!'

দিদি ঘরটা পেয়ে গেল। রোবুর বিশ্বাসঘাতকতায় আমার খুব রাগ হল। ঠিক করলাম, ওকে জব্দ করতে হবে।

আমাদের রোবুর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সেটা হল, 'ও সুন্দর খাবার ভঙ্গী করতে পারে। ওর নাকের জায়গায়টার ঠিক নীচে আছে একটা ফুটো, যেটা ইচ্ছামত লক (Lock) করা যায়। মাঝে মাঝে মজা করবার জন্যে আমরা লক খুলে দি। তখন ও হাতের সামনে যে সব খাবার জিনিস পায়, সমস্তই ভরে ফেলে ফুটোর মধ্যে। তারপর সেই খাবার ওর পেটের মধ্যের একটা ফাঁকা টিউবে এসে জড়ো হয়। অয়েলিং করার সময় শ্যামল-দা সেগুলো বের করে নেন। অবশ্য বেশীর ভাগ সময়ই লক করে রাখা হয় ওর মুখ। তা না হলে এত বেশী খাবে যে পেটের ভেতরের টিউব ভর্তি হয়ে ফেটে যেতে পারে। তখন আবার মুশকিল হবে।

একদিন বিকাল বেলায় আমাদের প্রতিবেশীরা এলেন আলাপ করতে। বিশাল হল ঘরের বিরাট টেবিলের চারদিকে বসলেন সকলে। খাবার পরিবেশনের ভার পড়লো রোবুর উপর। রোবু সুচারুভাবে সকলকে খাবার পরিবেশন করে নিজের খাবারটা নিয়ে বসলো আমার পাশের খালি চেয়ারটায়। আমি ওর মুখের লক খুলে দিলাম। অনেক-ক্ষণ আগে থেকেই আমি এই সুযোগের প্রতীক্ষা করছিলাম। এইবার ওকে অপদস্ত করবার জন্য আমার প্লেটের সমস্ত বিস্কুটগুলো ভরে ফেলে বলে উঠলাম, 'সকলে দেখুন, পেটুক রোবু চুরি করে আমার সমস্ত বিস্কুট সাবার করেছে'।

রোবু দারুণ লজ্জায় মুখ নামালো। মুখ তুলতেই পারল না আর।

শ্যামল-দা ওকে বললেন, 'বি আপ অ্যাণ্ড ডুইং, রোবু।'

রোবটদের একটা প্রধান অসুবিধা হল-এরা নিজেদের খেয়ালখুশী মত কাজ করতে পারে বটে, কিন্তু মানুষের আদেশ অমান্য করতে পারে না কিছুতেই।

শ্যামল-দার আদেশ শুনে রোবু হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়। ওর হাতে ধরা আমার পকেটে রাখা বিস্কুটগুলো। ও বিস্কুট-গুলো সকলকে দেখিয়ে বলে উঠলে, 'দেখুন আপনারা, এগুলো লুকিয়ে রেখে আমায় অপ্রতিভ করতে চেয়েছিল শুভাশীষ।'

রোবুর অসাধারণ বুদ্ধি এবং কর্মপটুতার জন্যে ওকে খুবই ভালো লাগছিল আমার। কিন্তু ওর সঙ্গে মজা করবার লোভও আমি সামলাতে পারি না।

একদিন আমি বসে বসে আমার সমস্ত পেনগুলো পরিষ্কার করছিলাম। নানা দেশের রকম রকম পেন সংগ্রহ করাটা আমার এক বাতিক। ত্রিশ রকমের ত্রিশটা পেন আছে আমার। এক মনে কাজ করছিলাম; কখন যে রোবু এসে পাশে বসেছিল টের পাই নি। হঠাৎ ওর খনখনে গলা কানে এল, 'আমাকে একটিবার লিখতে দেবে এগুলো দিয়ে?

'তুমি পাররে না রোবু। এত সুন্দর পেনগুলো নষ্ট করবে শেষকালে। আমি ওকে বোঝাতে চাইলাম।

রোবু থামলো না। ও বারবার আমাকে অনুরোধ করতে লাগলো। আমি ওকে পাত্তা দিলাম না। কিন্তু শেষকালে এমন প্যানপ্যানানি শুরু করলো যে প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে পেনগুলো ওর দিকে ঠেলে দিয়ে বললাম, 'নাও গেলো।'

এই বলে আমি উঠে দাঁড়ালাম। পেনের কালি কেনবার জন্যে পা বাড়ালাম বাজারের দিকে। আমি আশা করছিলাম, রোবু নিশ্চয় আমার পিছনে পিছনে চলে আসবে। তারপর আমাকে বিরক্ত করবার জন্যে মাফ চাইবে আমার কাছে। ওর মত বুদ্ধিমান রোবট নিশ্চয় বুঝতে পারবে যে ওর উপর সাংঘাতিক রেগে উঠেছি আমি।

বাজার থেকে বাড়ী ফিরতেই একটা শোরগোল শুনতে পেলাম ভিতরে। দিদি আমাকে রাগতভাবে জিজ্ঞাসা করলো, 'কি করেছিলি ওকে?'

'কাকে'? বিমূঢ় হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

'সত্যি করে বল্, কি করেছিলি রোবুকে।'

'কেন, কি হয়েছে ওর?'

'মারা গিয়েছে।'

'সেকি! তাও আবার হয় নাকি? ইয়ারকি করছিস না তো?'

'বিশ্বাস না হয় তো দেখবি চল্ না!'

দুড়দাড় করে উপরে উঠে গেলাম আমি। আমার ঘরে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম, রোবু পড়ে রয়েছে মেঝেতে। ওর পেটের স্ক্রুগুলো খোলার চেষ্টা করছেন শ্যামল-দা।

আমায় দেখে ছলছলে চোখে ভারি গলায় বলে উঠলেন 'মারা গেল রোবু!- ওকে আর সারানো যাবে না।'

'কেন কি হয়েছে ওর?'

'তোর সমস্ত পেনগুলো খেয়ে ফেলেছে রোবু। তার ফলে যা হবার তা হয়েছে। পেটের টিউব বাস্ট করেছে শর্ট-সার্কিট হয়ে ভিতরের সমস্ত যন্ত্র নষ্ট হয়ে গেছে।'

মাথায় হাত দিয়ে মেঝের উপর বসে পড়ে আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, এত বুদ্ধিমান হয়েও 'নাও গেলো'-বিরক্তিসূচক এই সামান্য কথাটার আসল মানেটা কেন বুঝতে পারলো না ও।

৪নং ভবানী ঠাকুর লেন, উত্তর ফটক, বর্ধমান।

প্রাণিজগতে বৈচিত্র্য

নিলয় সরকার

বৈচিত্র্যময় এই বিপুলা পৃথ্বীর বিচিত্র বস্তুসম্ভার আমাদের প্রতিনিয়তই আকর্ষণ করে। তাইতো মানুষ অজানাকে জানতে, অচেনাকে চিনতে যুগ যুগ ধরে ছুটে চলেছে। পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রাণী, উদ্ভিদ, জড়বস্তু সর্বক্ষেত্রেই বিচিত্রতা বিদ্যমান। আজ তোমাদের প্রাণিজগতের বৈচিত্র্যের কথাই শোনাব।

প্রথমেই তোমাদের দুটো প্রশ্ন করছি। (১) পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম প্রাণী কোন্‌টি? এবং (২) পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাণী কোন্‌টি? তোমরা হয়তো জানো যে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম প্রাণী হচ্ছে ম্যালেরিয়া জীবাণু যাদের দেহের বিস্তার এক ইঞ্চির আট হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। আর বৃহত্তম প্রাণীটির নাম নীল তিমি। এরা লম্বায় ১০০ ফুট ও ওজনে প্রায় ত্রিশটি বড় হাতির ওজনের সমান (৩০০০ মন) হয়ে থাকে।

ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবাল দ্বীপে এক বিচিত্র ধরনের বিশালাকার ঝিনুক দেখা যায়। এরা মানুষকে আক্রমণ করতেও পিছপা হয় না। এদের দৈহিক বিস্তার ও ওজন শুনলে আশ্চর্য হবে তোমরা। এদের ওজন ৫০০ পাউণ্ড এবং দৈহিক বিস্তার ৪ ফুট পর্যন্ত হয় বলে জানা গেছে। বিচিত্র প্রজাতির এই ঝিনুকগুলি স্বচ্ছন্দে ১০০-১৫০ বৎসর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে।

তোমরা অনেকেই সমুদ্র দেখেছ। আবার কেউ কেউ হয়তো রাত্রিতে সমুদ্রের জলে আলোর মালা দেখে থাকবে। দেখে মনে হয় কেউ যেন সারি সারি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে। এর কারণ কি জানো? সমুদ্রের জলে ন'কটি লুকা মিলিয়ারিস নামে এক প্রকার জীবাণু বাস করে। এরাই এই আলোর মালার কারণ।

গত বৈশাখ সংখ্যার 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান'-এর 'নূতন কীট' (৪৮ পৃষ্ঠা) সম্বন্ধে নিশ্চয় পড়েছ। এরা এক বিচিত্র ধরনের কীট। এই কীটের সন্ধান পাওয়া গেছে দক্ষিণ আমেরিকার নিকটবর্তী গ্যালাপ্যাগস দ্বীপে। এই দ্বীপে এক প্রকার কচ্ছপ পাওয়া যায়। এরা ছয় ফুট দীর্ঘ এবং ওজনে এক হাজার পাউণ্ড পর্যন্ত হয়। এদের আয়ু প্রায় দেড়শো বৎসর। আশ্চর্যের বিষয় কিছু না খেয়েই এরা এক বছর বেঁচে থাকতে পারে।

তোমরা সকলেই জানো যে—পাখিরা মাছ খায়। কিন্তু আমি বলছি মাছেরাও পাখি খায়। কি? কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, তো? অবিশ্বাস্য হলেও কথাটা কিন্তু সত্যি। সোনালী ঠোঁট যুক্ত ছোট্ট সুন্দর পাখি যার বিলেতী নাম 'মেরিল্যাণ্ড ইয়েলো থ্রোট'। উত্তাল সমুদ্র বক্ষে এরা খেলা করে বেড়ায়। সমুদ্র বক্ষে উড়তে উড়তে এরা হঠাৎ অতল জলে অদৃশ্য হয়ে যায়। আসলে ব্যাপার কি হয় জানো? বিরাট হাঁ-মুখ করা এক কালো 'বাস' মাছ এদের টপাটপ্ গিলে ফেলে। শুধু কি 'মেরিল্যাণ্ড'? না; ছোট্ট হাঁসের বাচ্চাদেরও এর হাত থেকে নিস্তার নেই। তোমরা হয়তো ভাবছ যে 'বাস' কেবল ছোট ছোট পাখি ধরেই খায়। এরা কিন্তু বড় পাখি ধরে খেতেও ওস্তাদ। একটা ২৪ ইঞ্চি 'বাস' মাছ ১৭ ইঞ্চি লম্বা একটা কুট্ পাখিকে ধরে অনায়াসে খেয়ে ফেলতে পারে। এই কুট পাখিদের ওজন ৮শো-৯শো গ্রাম পর্যন্ত

হয়। 'বাস' মাছ ছাড়াও উত্তর সাগরের পাইক ও জাক্ মাছ পাখি ধরে খায়।

এক জায়গায় চার্লস ডারউইন লিখে গেছেন—নীল চোখ বিশিষ্ট সাদা রং-এর পুরুষ বিড়ালেরা সাধারণতঃ কালা হয়ে থাকে। চার্লস ডারউইন ও ডাক্তার হেল হোয়াইট বলেছেন—কোনো বিষাক্ত দ্রব্য সাদা বর্ণের ভেড়া, শূকর ও ইঁদুর এবং গাঢ় বর্ণের ঐ একই জাতীয় জন্তুর দেহে ভিন্নভাবে ক্রিয়া করে।

প্রাণিজগতের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বৈদ্যুতিক মাছের কথা বলেই এই লেখা আমি শেষ করব। ব্রজিলের নদ-নদী ও জলাশয়ে তড়িৎ উৎপাদক বাইন মাছ পাওয়া যায়। এরা নিজ দেহে ইচ্ছামত শক্তিশালী ও দুর্বল তড়িৎ উৎপাদনে সক্ষম। বাইন মাছ জলে ২৫০ ভোল্ট ও স্থলে ৫০০ ভোল্ট তড়িৎ উৎপাদন করতে পারে। নিউ ইয়র্কের কোনো এক জলাধারে একটি বড় বৈদ্যুতিক বাইন মাছ ছিল। এর বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে বাতি জ্বালানো ও ঘণ্টা বাজানো গিয়েছিল।

'ইলেকট্রিক-রে' বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম। ভূমধ্য-সাগরে এক প্রকার বৈদ্যুতিক মাছ পাওয়া যায়। এরা ২০-৩০ ভোল্ট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম। টর্পেডো মাছ গ্রীষ্মকালে সমুদ্রে দেখা যায়। এরা এদের উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে ৩০০ ভোল্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে।

আফ্রিকার নীলনদে 'র‍্যাডার যন্ত্র' সংযুক্ত **মরিমাইরাস** নামক এক প্রকার বিচিত্র বৈদ্যুতিক মাছ দেখা যায়। এরা লেজের গোড়ায় পর্যায়ক্রমে সেকেণ্ডে কয়েক শ' বার বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। ফলে এর বৈদ্যুতিক চৌম্বক ক্ষেত্র পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন বস্তু কর্তৃক অল্পবিস্তর বিপর্যস্ত হয় এবং বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত 'র‍্যাডার যন্ত্র'-এ আঘাত করে। এই র‍্যাডার অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন হওয়ার ফলে 'মরিমাইরাস' পার্শ্ববর্তী কোনো বস্তুর উপস্থিতি খুব সহজেই জানতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে—কোনো জলাধারে এই মাছ রেখে দূরে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়িয়ে স্থির তড়িৎ উৎপন্ন করলেই এই মাছ উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

প্রাণিজগতের বৈচিত্র্যের কথা এখানেই শেষ করছি। সম্ভব হলে পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে উদ্ভিদ ও জড়-জগতের বৈচিত্র্যের সম্বন্ধে আলোচনা করব।

কান্দী থানা, পোঃ কান্দী, মুর্শিদাবাদ

(গত সংখ্যার বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার সমাধান)

১। পরমশূন্য নামে অভিহিত করা হয়।

২। উত্তল লেন্স থাকে।

৩। ক্যালসিয়াম ক্লোরো হাইপোক্লোরাইট।

৪। সাধারণ লবণ তড়িৎ বিশ্লেষ্য।

৫। ঘনকের একটি তলের দৈর্ঘ্য 4 সেন্টিমিটার।

৬। ল্যাক্টোমিটার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

৭। 540 ক্যালোরি প্রতি গ্রাম।

৮। $ZnCO_3$ (শুষ্ক কার্বনেট)

৯। জার্মান বিজ্ঞানী 'অটো ভন গেরিক' 1650 খ্রীস্টাব্দে প্রথম বায়ু পাম্প আবিষ্কার করেন।

১০। পৃথিবীর ব্যাস অপেক্ষা নেপচুনের ব্যাস প্রায় চারগুণ বেশী।

১১। স্যার ওয়াটসন-ওয়াট 'রাডার' যন্ত্রের আবিষ্কর্তা।

১২। জলজ উদ্ভিদ 'ঝাঁঝি' মূলহীন উদ্ভিদ।

১৩। অগ্ন্যাশয় হতে নিঃসৃত উত্তেজক রসের নাম 'ইনসুলিন'।

১৪। প্রস্টেট গ্রন্থি হতে নিঃসৃত হর্মোন বা উত্তেজক রসের নাম 'প্রস্ট্যাগ্ল্যাণ্ডিন'।

১৫। উরুর হাড় (নাম FEMUR) মানুষের দেহের দীর্ঘতম হাড়।

হাবুলের বিজ্ঞান-ভাবনা

ধীরেন বল

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ায় প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য ২ টাকা। বারো মাসের বৈশাখ–চৈত্র গ্রাহক চাঁদা ২০ টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।
- গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। under certificate of posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত ৩০ টাকা পাঠাতে হবে।
- M. O. বা Bank Draft KISHORE JNAN-BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।

এজেন্টদের জন্য

- ১০ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা ২৫ টাকা।
- ভি. পি. বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হবে। ডাক-মাশুল লাগবে না।
- এজেন্টদের অর্ডার অনুযায়ী সংখ্যা পিছু ১ টাকা করে অগ্রিম জমা রাখতে হবে।
- এলাকা ভিত্তিক এজেন্সীর জন্য সাক্ষাতে অথবা চিঠিতে যোগাযোগ করুন।

লেখকের প্রতি

- বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং সর্বসাধারণের উপযোগী জনপ্রিয় বিজ্ঞানের রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে। লেখার ভাষা ছোটদের উপযোগী এবং লেখার ভঙ্গি সহজবোধ্য হওয়া প্রয়োজন।
- ফুলস্ক্যাপ কাগজের একপিঠে বাঁদিকে মার্জিন রেখে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা পাঠাতে হবে।
- আনুমানিক শব্দসংখ্যা ২৫০০।
- লেখার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি (লাইনড্রয়িং/হাফটোন)-যুক্ত থাকা প্রয়োজন।
- রচনার শেষে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি যুক্ত থাকা প্রয়োজন।
- প্রকাশিত রচনার বিষয়ে সর্বপ্রকার দায়িত্ব লেখকের, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান কর্তৃপক্ষের নয়।
- অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য সম্পাদকীয় দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে।

সম্পাদক : কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

উপহার ও পাঠাগারের বই

কিশোর ক্ল্যাসিক্‌স

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- ভেপান্তর

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- ছোটদের কাশীনাথ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- কিশোর অপু
- অপুর ছেলেবেলা
- ছোটদের অপরাজিত

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
- ছোটদের কাজল

বুদ্ধদেব বসু
- অপরূপ রূপকথা ১০-০০

পশুপাখী-বনজঙ্গলের গল্প

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
- বনেজঙ্গলে
- পশুপক্ষী

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
- পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ

কেনেথ অ্যাণ্ডারসন
- বাঘের গর্জন

ছবি ও ছড়া

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
- খুকুমনির ছড়া ১০-০০
- রাঙা ছবি ৩-০০

অন্নদাশঙ্কর রায়
- হট্টমালার দেশে

ঘনাদা ও টেনিদার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র
- ঘনাদার জুড়ি নেই
- মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা
- ঘনাদা বিচিত্রা

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়
- টেনিদার অভিযান ১৫-০০
- চারমূর্তি ৫-০০
- ঝাউবাংলোর রহস্য ৫-০০
- কম্বল নিরুদ্দেশ ৫-০০

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী ও কল্পবিজ্ঞান

জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচি প্রণীত
- বিশ্বের বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ১০-০০
- মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন ৮-০০
- আচার্য জগদীশচন্দ্র ৪-০০
- বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ৪-০০
- পরমাণুবিজ্ঞানী ভাবা ৪-০০

সমরজিৎ কর
- নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ১০-০০

সাধন দাশগুপ্ত
- আলো আরও আলো ১৫-০০
- রোমাঞ্চকর রসায়ন ১২-০০

অমরনাথ রায়
- সংখ্যা নিয়ে খেলা ৫-০০
- জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা ৫-০০

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
- মেঘনাদ ৮-০০ লুপ্তধন ৮-০০

বাঙালী রবিনহুডের কাহিনী

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
- বাঙলার ডাকাত চারখণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ড ৬-০০
- মহিম ডাকাত ১০-০০

ফ্যান্টাসী, রহস্য ও অভিযান

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- সুন্দরবনে সাত বৎসর ৫-০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
- হাতিচোর ৬-০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
- ছোটদের সন্দীপন পাঠশালা ১০-০০
- রামধনু ৬-০০

দক্ষিণারঞ্জন বসু
- কায়াহীনের কবলে ৪-০০
- হট যাও হার্মাদ ৫-০০

ধীরেন্দ্রনাথ ধর
- দুরন্ত যাত্রী ৫-০০

কোনান ডয়েল
- শার্লক হোমসের কিশোর গোয়েন্দা গল্প ৭-০০
- শার্লক হোমসের কিশোর রহস্য গল্প ৭-০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ • ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত
এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দুই টাকা।
প্রচ্ছদমুদ্রণ: রূপসা এণ্টারপ্রাইজ, ২০০ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২